'চৌ-চৌ' নামটির পরিচয়-স্বত্রে স্বর্গীয় ঔপন্যাসিক দামোদর মুখোপাধ্যায়ের 'যোগেশ্বরী' নামক উপন্যাস হইতে একটি অংশ এখানে তুলিয়া দিলাম।

"* * * দাক্ষিণাত্যে এক সম্প্রদায় ফেরিওয়ালা আছে, তাহারা আপনাদের পণ্য সামগ্রী, ঝুড়ি বাক্স প্রভৃতির মধ্যে লইয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পর্য্যটন করিয়া বেড়ায়। সেই ঝুড়িতে বিভিন্ন রকমের সামগ্রী সংগৃহীত থাকে। ঐ ঝুড়ির নাম—চৌ-চৌ।"

এই বিভিন্ন রসপূর্ণ গল্পের বইখানির নাম ঐ অর্থে ই 'চৌ-চৌ' রাখা হইল।

১।এ, সত্যেন দত্ত রোড
কালীঘাট, কলিকাতা
আশ্বিন, ১৩৪৬।

—গ্রন্থকার।

গ্রন্থকারের অন্যান্য বই—

বরদা ডাক্তার	১৲
মুক্তাঝারি	১।০
মাটির স্বর্গ	২৲
বেড্ নম্বর ৩৯	২৲
ধাঁধার উত্তর	১।০
জমা-খরচ	১॥০
প্রিয়তমাসু	২।০
'৭০৩'	১॥০
জগদীশের টিকদারী [নাটক—মিনার্ভায় অভিনীত]	॥০
স্ত্রী	১।০
'—সকলি গরল ভেল'	১৷৷০
রসের নাড়ু (বালক পাঠ্য)	৷৴০
পথের স্মৃতি	২।০
নীতি ও কাহিনী (স্কুল পাঠ্য)	৷৴১০

সর্ব্ব শুভ কামনার সহিত

স্নেহভাজন—

শ্রীমান ভূপেন্দ্রনাথ বল্লভকে—

—চৌ-চৌ—

পেটের দায় ও প্রেমের দায়

ঝিন্‌ঝিনিয়া—থর্‌থরিয়া রোগের ভয়ে সারা গাঁয়ের লোক আতঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। হাটে, ঘাটে, মাঠে, দোকানে, বৈঠকে সর্ব্বত্রই ওই কথা—ওই আলোচনা।

বেলা প্রায় আড়াই প্রহরের সময়, অনন্ত ব্যস্ত হইয়া বাটী প্রবেশ করিল এবং উঠানে দাঁড়াইয়া ডাকিল—"পিসীমা—পিসীমাগো! ঝিন্‌ঝিনিয়া থর্‌থরিয়া!—হরে কামারের! বেটা মরেছিল আজ। ত্রিশ কলসী জল ঢেলে তবে বাঁচান গেল।"

প্রত্যূষে ঘুম হইতে উঠিয়া অনন্ত যখন বাহির হইয়া যায়, তখন পিসীমা তাহাকে বলিয়াছিল—ঘরে চাউল, তৈল এবং মসলা নাই। দোকান হইতে ওইগুলি না আনিয়া দিলে আজ আর আহারের ব্যবস্থা হইবে না।

শুনিয়া, অনন্ত ঘাড় নাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল। তাহার পর বেলা এক প্রহর পর্য্যন্ত পিসীমা তাহার অপেক্ষায় পা ছড়াইয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়াছিল। তাহার পর, আজিকার আহারাদির সম্বন্ধে হতাশা এবং ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি ক্রোধ যখন একসঙ্গে ক্রমেই খুব বাড়িয়া উঠিল, তখন তাহার সঙ্গে আসিয়া যুক্ত হইল—সংসারের এই অনটনের ঘোর দুঃখটা। সঙ্গে-সঙ্গেই তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল—"মরণ হ'লেই বাঁচি!"

হয় ত মরণ হইলে, পিসীমা বাঁচিয়া যায় সত্য, কিন্তু অনন্তরও মৃত্যু হয় ত তাহাতে আসন্ন হইয়া পড়ে। কারণ, স্বামি-পুত্রহীনা পিসীমাই বিধবা ভ্রাতৃজায়ার মৃত্যুর পর, ভাইয়ের এই কষ্টের সংসারে থাকিয়া অনন্তকে নানা দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়া মানুষ করিয়া আজ বত্রিশ বৎসর বাঁচাইয়া রাখিয়াছে; কিন্তু আর পিসীমা পারিয়া ওঠে না। তাই দিনের মধ্যে বিশ বার তাহার দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে আর দশ বার তাহাকে মরণ কামনা করিতে হয়।

প্রায় অপরাহ্ণবেলায় শুধুহাতে অনন্তকে এই ভাবে ফিরিতে দেখিয়া রাগে ও দুঃখে পিসীমার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। অনন্তর মুখের দিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিবার পর কহিল—"সকালে যে বলেছিলুম, আজ চাল-টাল কিছু এনে না দিলে রান্না চড়বে না, সে কথাটা মনে ছিল কি? হরে কামারের ঝিনুঝিনে না হয়ে তোর হ'য়ে যদি তুই মরতিস্, জন্ম হ'লে হাড়ে আমার বাতাস লাগতো। বত্রিশ বছরের ধাড়ি হলি, এখনো তোর আক্কেল ব'লে জিনিষটা হোলো না।"

পিসীমা জানে না যে, ভ্রাতুষ্পুত্রের আক্কেল যথেষ্টই আছে—নাই কেবল পয়সা। চাউল অভাবে যে আজ রান্না হইবে না, অনন্ত তাহা বুঝিয়াছিল,

কিন্তু বুঝিয়াও কোন উপায় করিতে পারে নাই। দোকানে আর সে ধার পায় না, কাহারও কাছ হইতে দু'চার আনা কর্জ্জ পাওয়ারও আশা নাই। বিক্রয় করিবার ও বন্ধক দিবার মতও ঘরে তেমন কিছু নাই; সুতরাং সকাল সকাল বাড়ী ফিরিয়াই বা লাভ কি, আর হরে কামারের মাথায় ত্রিশ কলসী জল না ঢালিয়াই বা করে কি? পিসীমার কথায় মনে মনে বলিল যে, এমন দিন কবে হবে, যে দিন ঝিন্‌ঝিনে ধরে এজন্মের মত পেটের দায় থেকে তাকে উদ্ধার করবে। বউটা যখন ম'রে গেল, সেই সঙ্গে সেও যদি মরতে পারতো!

পিসীমা কহিল—"আর হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন, নেয়ে-টেয়ে এস। এসে, দুটো ভাত কুটিয়ে রেখেছি, আমার মাথাটা চিবিয়ে টাক্‌না দিয়ে খাও।"

কয়েক দিন আগে চক্কোত্তি-বাড়ী পিসীমা দুই আনার ঘুঁটে দিয়াছিল। তাহার দামটা পাওনা ছিল। পয়সার বদলে সকালে আজ পিসীমা তাহাদের বাড়ী হইতে সের দুই চাউল আনিয়াছিল।

বেলা তিন প্রহরের সময়, হেলাঞ্চা শাক সিদ্ধ ও তেঁতুল সংযোগে একরাশ অন্ন উদরস্থ করিয়া অনন্ত একটি বিড়ি ধরাইয়া বার-বাড়ীর আমতলাতে আসিয়া বসিল। পৌষের পড়ন্ত রৌদ্র তখন পশ্চিমের পাট-ক্ষেতখানার উপর নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছিল। অদূরে ডোবার ধারের খেজুর গাছটায় শিউলী মাথা কাটিয়া ভাঁড় বাঁধিয়া দিতেছিল। তাহারই তলায় কতকগুলা ছাতার পাখী নীরবে এবং একান্ত মনে মাটী হইতে কি খুঁটিয়া খুঁটিয়া খাইতেছিল। পিছনে নন্দ কাঠের খামার হইতে ধান-ঝাড়ার শব্দ আসিতেছিল। শেষ একটা টান্ দিবার পর হাতের বিড়িটা

ফেলিয়া দিয়া অনন্ত উঠিয়া দাঁড়াইল এবং গায়ের র‍্যাপারখানা ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া, মাঝের পাড়ার পথে অগ্রসর হইল।

মাঝের পাড়ার রায়েদের জামাই আসিয়াছিল। অনন্ত তাহারই কাছে গিয়া বসিল।

জামাই বাবুটির পুরাতন মুদ্রা সংগ্রহের নূতন সখ হইয়াছিল। সেই সম্বন্ধে নানারূপ কথাবার্ত্তা হইতে হইতে অনন্ত কহিল—"কোলসাঁড়ার হাটের কার্ত্তিক ময়রার কাছে চন্দ্রগুপ্তের আমলের একটা টাকা আছে। গেল হাটে তাকে আমি বললুম, একটা টাকা দিচ্ছি, ঐটে আমায় দে। সে রাজী হ'ল না। বললে—ওটা খুব পয়মন্ত টাকা, ও কি ছাড়তে পারি; তবে পাঁচটা টাকা কেউ দিলে পরে দিয়ে দি।"

জামাই লাফাইয়া উঠিল। কহিল—"চন্দ্রগুপ্তর আমলের টাকা! পাঁচ টাকা দিলেই দেবে? আপনি ত হাটে যাচ্ছেন; পাঁচ টাকা আমি আপনাকে দিচ্ছি, যদি দয়া ক'রে সেইটে—"

পাঁচটা টাকা পকেটে ফেলিয়া অনন্ত কোলসাঁড়ার হাটের পথে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার কিছু পরে, শীতে হি হি করিয়া, হাঁপিতে কাঁপিতে, ভিজা কাপড়ের একটা পুঁটলী ঝুলাইয়া সে বরাবর জামাইবাবুর কাছে আসিয়া কহিল—"আজ একেবারেই হয়ে গিছলুম!"

অতিমাত্রায় চমকিত হইয়া জামাই জিজ্ঞাসা করিল—"ব্যাপার কি?"

"ঝিন্‌ঝিনিয়া! থর্‌থরিয়া! হোল ত হোল—আমারই হোল! তা'ও একেবারে হাটের মাঝে! উঃ, শীতে মরে গেলুম, পঞ্চাশ ঘড়া জল ঢেলেছে

মাথায়। এক কাপ চা আমাকে আনিয়ে দিন একটু শীগ্‌গির। টাকা পাঁচটা সেই ঝোঁকে কোথায় গেল, কে নিলে, তার আর কোন খোঁজই পেলুম না। আপনার আর ক্ষতি হোতে দেবো না! এবার যখন আবার আসবেন, সেই সময় দিয়ে দেব আপনাকে।"

"সে আর আপনাকে দিতে হবে না। আপনি যে বেঁচে গেছেন, সেই যথেষ্ট! দেখছি, চন্দ্রগুপ্তর আমলের খুব পয়মন্ত টাকাই বটে!"

চা খাইয়া অনন্ত ভিজা কাপড়খানি হাতে লইয়া বাড়ী ফিরিল। পিসীমা কহিল—"হ্যাঁ রে, সন্ধ্যে পর্য্যন্ত শুয়ে রইলি, তার পর উঠে, শুধু শুধু কাপড়খানা জলে ডুবুলি, তার পর—ভিজে কাপড়খানা হাতে নিয়ে বেরুলি, আবার ফিরে এলি। তোর ব্যাপার কি বল্ তো, অনা?"

"ব্যাপার আমার মাথা আর মুণ্ডু! ব্যাপার—পেটের দায়!"

২

হরি কামার ঝিন্‌ঝিনিয়া—কম্পম্যানিয়ার হাত হইতে রক্ষা পাইবার পর, আর এক মহা-বিপদে পড়িয়াছিল। সে বিপদের ডাক্তারী নাম—ভুতুড়িয়া উত্‌প্যাটিয়া, অর্থাৎ ভুতুড়ে উৎপাত! সত্যই, কয়দিন ধরিয়া তাহার বাড়ীতে এরূপ ভৌতিক উৎপাত হইতে লাগিল যে, আতঙ্কে ও দুশ্চিন্তায় বাড়ীর সকলের আহার-নিদ্রা প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। শেষকালে সে স্বপ্নে আদেশ পায়,—অনন্তর উঠানের বেলগাছের তলায় সন্ধ্যাবেলায় চাল-ডাল তরকারী ইত্যাদির সিধা সাজাইয়া রাখিতে হইবে আর তিন বার মন্ত্র পড়িতে হইবে—

"রেখে গেলাম চাল-ডাল
তরকারি, ফল, মিষ্ট।
মাঠের ভূত মাঠে যাও,
কোরো না অনিষ্ট।"

বাস্তবিকই অনন্তর বেলগাছের তলায় যেদিন সন্ধ্যায় হরি কামার সিধা রাখিয়া দিয়া তিনবার 'মাঠের ভূতের' মন্ত্র পড়িয়া চলিয়া গেল, সে দিন হইতে আর তাহার বাড়ীতে কোন উৎপাত হয় নাই। হরি কামার নিষ্কৃতি পাইল বটে, কিন্তু উৎপাত আরম্ভ হইল আবার নন্দ অধিকারীর বাড়ী।

নন্দও সিধা সাজাইয়া দিয়া মন্ত্র পড়িয়া আসিবার পর হইতে ভূতের

অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইল। কিন্তু পরদিনই রাত্রে আবার সিদ্ধু ঘোষের বাড়ী ঢিল, কাঁকর, হাড়, মড়ার কলসীর কাণা-ভাঙ্গা, পোড়া কাঠের টুকরা, কাঁকড়া-কাছিমের খোলা, মরা ইঁদুর প্রভৃতি পড়িতে লাগিল।

সিদ্ধেশ্বরও সিধা দিয়া আসিল।

অতঃপর গ্রামের বহু গৃহেই উৎপাত সুরু হইতে লাগিল। সিধা ও মন্ত্র প্রভৃতির জ্বালায় অনন্তই ক্রমে উত্যক্ত হইয়া পড়িল; কিন্তু উপায় নাই। ভূতুড়ে কাণ্ড। একটু হাঙ্গামা সহ্য না করা ভিন্ন উপায় নাই। পিসীমা কহিল,—"হ্যাঁ রে অন্তা, আমার ত বাপু ভয়ে রোজ গা কাঁপে। আমারি বাড়ীতে—এই ধর্ গিয়ে—একটা অপদেবতার ব্যাপার ত—রাত্রে তাঁরা এসে ঐ সব খাদ্য ত নিত্যি খেয়ে যান! আমার বাবু কেমন যেন গা ছম্-ছম্ করে। সমস্ত রাত, আমার যেন মনে হয়, উঠোনের মাঝে চলে বেড়াবার শব্দ আর ফিস্-ফাস্ আওয়াজ হয়। তা—"

"পিসীমা, মনে তোমার যাই হোক, মুখ দিয়ে কিছু আর প্রকাশ কোরো না।—রাত্তিরে যেন ঘর থেকে একলা বেরিও-টেরিও না। দরকার হ'লে আমায় ডেকো।"

সেদিন রাত আড়াই প্রহরের সময় বীরু ঘোষালের বাড়ী উৎপাত আরম্ভ হইল। মাটীর ঢেলা, খোয়া, ডিমের খোলা, কুকুরের ঠ্যাং প্রভৃতি পড়িতে লাগিল। বীরু ঘোষাল ভয়ে কাঠ হইয়া, ঘরে তিনটা আলো জ্বালিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ঘোষাল-গিন্নী আতঙ্কে চীৎকার জুড়িয়া দিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েগুলাও যোগদান করিল। সেই চীৎকারে এ-বাড়ীর ও-বাড়ীর যুবকরা বাহির হইয়া আসিয়া, ঘোষাল-

বাড়ীর বাহিরে দাঁড়াইয়া নানারূপ জল্পনা-কল্পনা শলা-পরামর্শ করিতে লাগিল।

রাত ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছে। চারিদিকে বিকট অন্ধকার। ঘোষাল-বাড়ীর খিড়কীর সংলগ্ন প্রকাণ্ড এক তেঁতুল গাছ। তাহারি তলায় পল্লীর যুবকগণ কাহাকে ধরিয়া, ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। টর্চের আলো ফেলিয়া দেখা গেল, সে লোকটার কোঁচড়ে মাটীর ঢেলা, ইট-পাটকেল, কাকড়ার খোলা প্রভৃতি তখনো অনেক রহিয়াছে। সে—হরি কামার।

হরি কহিল—"আমার কোন দোষ নেই তোমরা জানবে! শুধু অনন্তর পরামর্শেই আমি—"

"তুই বেটা কচি খোকা! অনন্তর পরামর্শ শুনতে গেলি কেন?"

"পেটের দায়ে, বাবু,—পেটের দায়ে! নইলে—"

"সে কোথায়—অনন্ত?"

"রক্ষিতদের বাড়ীর সামনে একটা বেড়াল মরে পড়ে আছে, তার ঠ্যাং কেটে আনতে গেছে।"

অন্ধকারে চুপিসাড়ে গিয়া পথের বাঁকে, বেড়ালের ঠ্যাং হাতে মাঠের ভূতের প্রধান ভূতটিকেও গ্রেপ্তার করিয়া ফেলা হইল। উভয় ভূতকে তখন নানাপ্রকার জেরা প্রশ্ন করিয়া জানা গেল যে, পিসীমা একটু নিদ্রা গেলেই সিধার চাল, দাল, তৈল, মসলাদি অনন্তর বাহির-বাড়ীর ঘরে চাবি-বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিয়া উভয়ে ভূতগিরি করিতে বাহির হয় এবং পরে দ্রব্যাদির ভাগ হয়—অনন্তর দশ আনা এবং হরির ছয় আনা!

দশ-আনী ভূতকে জিজ্ঞাসা করা হইল—"তুই এ রকম কায করিস কেন ?"

এক নিঃশ্বাসেই অনন্ত উত্তর দিল—"পেটের দায়ে।"

"পেটের দায়ে এরকম বদবুদ্ধি না খাটিয়ে কোন কাযকর্ম্ম ক'রে পয়সা উপায় করলেই ত ভাল হয়, অনন্ত।"

"ব'লে ত দিলে—কাযকর্ম্ম করলেই হয়, কিন্তু পাই কোথায় ? ক'রে দাও না কোথাও। বেশী টাকার আমার দরকার নেই। বউটা ত ম'রে গেছে, ছেলেপুলেও নেই। খালি বুড়ী পিসীর একটা পেট আর আমার একটা পেট। এই দুটো পেটের জন্যে, দু'টো শাকভাত হ'লেই যথেষ্ট।"

রাজু বলিয়া একটি ছেলে বলিল—"তুমি বাড়ী ছেড়ে কোলকাতা যেতে রাজী আছ, অনন্তদা' ?"

"যমের বাড়ী যেতেও গর-রাজী নই ;—পেটের দায় যে মহা-দায়।"

পথের যে স্থানটায় শশীর হাতের টর্চের আলোটা পড়িয়াছিল, সেইস্থানটায় অনন্তর দৃষ্টি স্থির হইয়া রহিল। লজ্জার গ্লানি এবং দুঃখের ভাব ক্রমেই তাহার মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল !

৩

সেই রাজু বলিয়া ছেলেটি, তাহার ভগিনীপতিকে ধরিয়া কহিয়া কলিকাতার শ্যামবাজার অঞ্চলের এক দোকানে অনন্তর কায জুটাইয়া দিয়াছে। মাহিনা ১০ টাকা আর খোরাকী। সে কলিকাতায় আসিয়া তাহার কাযে লাগিয়া গিয়াছে। সকাল ৬টা হইতে বেলা ১টা পর্য্যন্ত তাহার 'ডিউটী'; বিকালের দিকে তাহার ছুটী।

এক দিন বেলা আন্দাজ পাঁচটার সময়, অনন্ত একটা চায়ের দোকানে বসিয়া চা খাইতেছিল। হঠাৎ দোকানের বাবু লাফাইয়া উঠিয়া কহিলেন—"ওরে, সেই গলায় আবওলা লোকটা যাচ্ছে! ওই যে—ও ফুটপাথে। নিমচাঁদ, বিপিন, দু'জনে দৌড়ে গিয়ে ধ'রে ফেল বেটাকে! ধরে, নিয়ে আয় টেনে এখানে!"

নিমচাঁদ ও বিপিন ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

গলায় আব-ওলা লোকটা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া হন্ হন্ করিয়া চলিতেছিল। নিমচাঁদ ও বিপিন যমদূতের মত গিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল, এবং হিঁচড়াইয়া টানিতে টানিতে দোকানের মধ্যে আনিয়া ফেলিল। দোকানের বাবুটি কহিলেন—"মার্, বেটাকে মার্। পকেট ওর দেখ, কিছু আছে কি না। থাকে ত—নিয়ে নে!"

তখন ঘুসিটা-আসটা, কিলটা-চড়টা তাহার উপর পড়িতে সুরু করিল। রাস্তার পথিকের দল—দোকানের সামনে ভীড় জমাইয়া ফেলিল।

—চৌ-চৌ—

লোকটার গায়ে ছিল একটা ময়লা ও তালী-দেওয়া হাফ-সার্ট। তাহার এক পকেটে পাওয়া গেল একটা দিয়াশলাই ও বিড়ির একটা ডিবা, আর এক পকেটে পাওয়া গেল—সাড়ে তিনটা পয়সা, ৩।৪ গুলি আফিং সমেত ছোট্ট একটা কৌটা, এক টুকরা লেড্‌পেন্সিল, একটা ডাল-ভাঙ্গা ফেলে দেবার উপযোগী অভব্য চশমা, বেলগেছিয়া চেরিটেবল ডিস্‌পেনসারির একখানা আউট-ডোর টিকেট, একখানা ছোট্ট ছিন্ন এবং কদর্য্য নোটবহি এবং একটি কাণে দিবার জন্য পায়রার পালক! হাঁক-ডাক এবং কথাবার্ত্তায় জানা গেল যে, লোকটি কয়েকদিন আগে এই দোকানে বসিয়া চা খাইতেছিল, সেই সময়ে একটি ছোকরা বাবু চারি আনার চা-চপ খাইয়া একখানি পাঁচ টাকার নোট দোকানীবাবুর হাতে দেয়। তখন 'ক্যাসে'ও ভাঙ্গানী ছিল না এবং দোকানেও খুব ভীড়। সুতরাং দোকানী-বাবু নোটখানি দোকানের একটি ছোকরাকে দিয়া পাশের দোকানে ভাঙ্গাইতে পাঠাইয়া বলিলেন—"চার টাকা বার-আনা ওঁকে দিতে হবে।" কাকে দিতে হবে—তা আর ছোক্‌রাটির জানিবার দরকার নাই। সে নোটখানি লইয়া বাহির হইয়া গেল! পাশের দোকানে ভাঙ্গানী পাইল না। তার পাশের দোকানে গেল। সেখানেও পাইল না। তার পাশে গেল। পাইল। ভাঙ্গানীগুলা গুণিতেছে, এমন সময় ঐ আব-গুলা লোকটি তাহার কাছে আসিয়া কহিল—"কি রে! নোট ভাঙ্গাতে এত দেরী? দে—দে, অত ক'রে আর গুণতে হবে না। তোর চার আনা তুই কেটে নে।" বলিয়া বক্রী চার টাকা বার আনা তাহার হাত হইতে লইয়া সে হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল। তাহার মধ্যে তিন দিন কাটিয়া যাইবার

পর আজ সে ধরা পড়িয়াছে এবং নিমচাঁদের রোগা ঘুসি এবং বিপিনের মোটা ঘুসি দু'চারিটি খাইতেছে। দোকানীবাবুও বাঁ-হাত উঁচাইয়া চড় তুলিলেন, কিন্তু হাতের রিষ্টওয়াচটি ভাঙ্গিয়া যাইবার ভয়ে চড়টি তিনি হাওয়ার সহিতই মিশাইয়া দিলেন।

অনন্ত শূন্য পেয়ালাটি রাখিয়া দিয়া কহিল,—"মারবেন না, মারবেন না। মেরে আর লাভ হবে কি? কিছু ত ওর নেই যে নেবেন। বরঞ্চ মার-ধোর না করলে লাভ আছে।"

বাবুটি কহিলেন—"কি লাভ?"

"আপনার ৪৮৹ ফিরে পেতে পারবেন।"

"দেবে কে?"

"আমি।"

অনন্ত পকেট হইতে ৪৮৹ বাহির করিয়া দোকানীবাবুটির হাতে দিয়া কহিল—"পেটের দায়ে লোকে কু-কায ক'রে ফেলে, মশাই। সে আর আপনারা বুঝবেন কি ক'রে? অভাবেই স্বভাব নষ্ট!"

সকলেরই দৃষ্টি অনন্তর উপর পড়িল। দোকানীবাবু কহিলেন—"আপনি লোকটার হয়ে দিলেন,—অবশ্য আপনার পক্ষে খুবই ভাল, কিন্তু এই রকম জোচ্চোরকে এ রকম সাহায্য করা—মানে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া—অর্থাৎ, বুঝলেন কি না? মানে হচ্ছে—"

"মানে, হোচ্ছে—খুবই দায়গ্রস্ত না হ'লে লোকে জোচ্চুরীর দিকে যায় না। অভাবে জোচ্চোর আর স্বভাবে জোচ্চোর। স্বভাবে জোচ্চোর—অতি কম; হয় ত লাখে এক। অভাবে জোচ্চোরই সব।"

"সব মানে ?"

"সব মানে—সব। এই আমি, আপনি, ইনি, উনি, তিনি, তাঁহারা ইত্যাদি। যাক্—এখন ছেড়ে দিন ওকে, বেচারা পালিয়ে বাঁচুক।—আপনার নাম কি মশাই ?"

আব-ওলা লোকটি বলিল,—"বামাচরণ বোস।"

লোকটা কাহারো দিকে না চাহিয়া দোকান হইতে বাহির হইয়া নীরবে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

রাস্তার একজন লোক সামনের ভীড় ঠেলিয়া আসিয়া কহিল—"লোকটা আমাদের পাড়ার ও-দিকে একখানা খোলার ঘড় ভাড়া ক'রে অনেকদিন ছিল। হালে ওর বউ মারা যাবার পর কোথায় উঠে গেছে! বৌটার কোন চিকিৎসাই হ'ল না। বেলগেছের ডিস্‌পেনসারী থেকে একটু আধটু দাতব্যের ওষুধ এনে খাইয়েছিল।"

"ওঃ, পকেটে তারিরই একখানা 'আউটডোর টিকিট' ছিল বটে ! ছেলে-টেলে ওর কেউ আছে না কি ?"

"তিনটি ছোট ছোট মেয়ে। লোকটা বেশ ভাল চাকরী করত। 'রিডাক্‌সানে' চাকরী যায়। নগদ কিছু টাকা-কড়িও ছিল; ওর কে একজন বিশেষ বন্ধু সেগুলো ফাঁকি দিয়ে হস্তগত ক'রে নিয়ে সবিশেষরূপে গা-ঢাকা দেয়।"

দোকানীবাবু কহিলেন,—তা'হলে লোকটা একটি হতভাগা, বোক-চন্দর এবং ভূত।"

অনন্ত কহিল—"হতভাগা ত'বটেই। আর ভূত যে, তার/আর কোন সন্দেহই নেই। পেটের দায়ে ভূত, প্রেত, শাঁকচুন্নী—সবই হতে হয়,

মশাই! আবার ভূতের দেবতা হয়ে সিধেও যোগাড় ক'রে নিয়ে খেতে হয়।"

এই সময় বিপিন রাস্তার দিকে দেখাইয়া কহিল—"ঐ দেখুন, আর এক জীব।"

অনন্ত কহিল—"কে উনি?"

দোকানী বাবু কহিলেন—"উনি একটি অদ্ভুত গোছের লোক। ছেলেবেলায় পড়েছিলুম—'পদার্থ দ্বিবিধ;—চেতন এবং অচেতন'। কিন্তু দ্বিবিধ নয়—ত্রিবিধ। চেতন অচেতন এবং অদ্ভুত। উনি সেই অদ্ভুত-জাতীয় জীব।"

"কি রকম?"

"অর্থাৎ লোকটি এক জন রিটায়ার্ড কুলি-কনট্রাকটার। বাড়ীতে স্ত্রী আছেন, ছেলেপুলে আছে। নাতনীরও বোধ হয় ছেলে হয়েছে। বয়স পঞ্চাশের কিছু এপার কি ওপার। চেহারাটি থপ-থপে, নাদুস্ নুদুস্, পরিপাটী,—সে ত দেখতেই পেলেন। টাকাও জমিয়েছেন—নেহাৎ কিছু কম নয়। কিন্তু—"

"কিন্তু কি?"

"কিন্তু একটি রোগেতেই ওঁকে মাটী করেছে। কোন মেয়ে-মানুষ যদি পথে-ঘাটে দেখলেন ত উনিও চল্‌লেন তার পাছু-পাছু, তাকে দেখতে দেখতে। ঐ দেখুন—দেখুন, ফিরে আসছে। আগে আগে ওটি বোধ হয় কারো বাড়ীর যুবতী ঝি-টি হবে; ঠিক ওর পেছু নিয়েছে।"

"অদ্ভুতই ত বটে।"

"সন্ধ্যার আগে দেশবন্ধু পার্কে ওঁকে রোজই পাবেন। ঐ সময়টা রোজই সেখানে হাওয়া খেতে ওঁর যাওয়া চাই। হাওয়া খাওয়া মানে—লেডিস্ পার্কের বেড়ার ফাঁকে মেয়েমানুষের রূপসুধা পান করা।"

অনন্ত মনে মনে স্থির করিয়া ফেলিল—এই লোকটার সঙ্গে একটু আলাপ-পরিচয়ের আবশ্যক।

৪

"বেজায় শীত পড়েছে। বলে—'মাঘের শীতে বাঘ পালায়'। এ সেই বাঘ-তাড়ানো শীত।"

রিটায়ার্ড কুলি-কনট্রাক্‌টার বাবুর কথায় অনন্ত কহিল—"আজ্ঞে শীতটা বড্ডই পড়েছে।"

শ্যামবাজার। দেশবন্ধু পার্ক।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে মেয়েদের পার্কের সন্নিকটস্থ একখানি বেঞ্চে বসিয়া, অনন্ত সেই কনট্রাক্টার বাবুটির সহিত আলাপ করিতেছিল। পার্কের ফটক দিয়া দলে দলে মেয়েরা পার্কের মধ্যে বায়ু সেবনার্থ প্রবেশ করিতেছিল। কনট্রাক্টার রাধিকা বাবুর দৃষ্টি সেই দিকেই আবদ্ধ।

অনন্ত কহিল—"আপনি এক জন মহাশয় এবং সদাশয় ব্যক্তি বোঝা যাচ্ছে। ধনবান্ এবং বিদ্বান হয়েও, আমার মত দরিদ্র এবং মূর্খের সঙ্গে যে এমনভাবে আলাপ করছেন, সেটা আপনার—"

"কিছু না, কিছু না, বসন্ত।" দৃষ্টি রাধিকা বাবুর সেই একই দিকে।

রাধিকা বাবুর কাছে অনন্ত তাহার নাম বলিয়াছিল—বসন্ত।

"দেখ, বড় বড় পণ্ডিতরা, পুরুষকেই নারীর চেয়ে সুন্দর ব'লে গেছেন। নজীর দেখিয়েছেন—যেমন ষাঁড়, সিংহ, ময়ূর, মোরগ, এই সব। কিন্তু মানুষের বেলা তাঁদের এ কথা নিশ্চয়ই খাটে না। মেয়ে

মানুষ যে পুরুষের চেয়ে কত বেশী সুন্দর, এ কি তাদের নজরে ঠেকে নি ? তুমি কি বল, বসন্ত ?"

"যা বলছেন আপনি, সে কথা ঠিকই—অতি ঠিক।"

"নিশ্চয়। দেখ দেখ, ঐ যে মেয়ে লোকটি গেল, ওর ঘাড়ের গড়নটা কি সুন্দর ! হাত দুটিও দেখলে—কি নিটোল ! বাস্তবিকই—"

"ঠিক—অতি ঠিক। পায়ের গড়নটি দেখলেন—কি চমৎকার !"

"তাই ত বলছি। এ জাতটাকে ভগবান্ যে কি হাত দিয়ে সৃষ্টি—"

"উঠলেন যে, চল্লেন না কি ?"

"আসছি—আসছি।"

সেই স্ত্রীলোকটি, যার ঘাড় ও হাতের গড়ন ভাল, তিনি তখনই পার্কের মধ্য হইতে বাহির হইয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। রাধিকা বাবু সামান্য কিছু ব্যবধানে থাকিয়া তাঁহার পিছু পিছু চলিলেন। খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বেঞ্চের উপর বসিয়া পড়িলেন।

চারি পাঁচ দিন ধরিয়া রোজই অনন্ত পার্কে আসে। রাধিকা বাবুর সহিত দেখা হয়। রাধিকা বাবু কথা কহিতে কহিতে হঠাৎ উঠিয়া যান; আবার আসেন; দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেন, বসেন, আবার যান।

সে দিন অনন্ত কথা উত্থাপন করিল—"পেটের দায়, মানুষের মহাদায়; মরণ-দায়ের চাইতেও—"

"দেখ,—মেয়েমানুষের যদি নিটোল দেহটি হয়, আর স্বাস্থ্য ভাল থাকে, তা' হলে শুধু একখানা ধব্‌ধবে সাড়ী পরলেই তাকে—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। যা বলছিলুম, পেটের দায়টা যদি না থাকে, তা হ'লে লোক সাধুও হতে পারে, শান্তিও—"

"এ রক্ত মাংস হাড় ক'খানার ভেতর ভগবান যে কি জিনিষ দিয়ে ওজের—বোস, আসছি। টপ্ করিয়া রাধিকা বাবু একটুখানি ওদিক হইতে ঘুরিয়া আসিলেন।

মহিলা-পার্ক হইতে একটি মহিলা বাহির হইয়া যাইতেছিলেন। বয়স বোধ হয় বছর ত্রিশ হইবে, কিন্তু সুন্দর স্বাস্থ্য ও গঠনের গুণে তাহাপেক্ষা কিছু কমই দেখায়। রংটি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু তাহাই তাঁহার সৌন্দর্য্যকে যেন বেশী করিয়া মাধুর্য্য দিয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়াই আবার রাধিকা বাবু দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। তৎপরেই তাঁহার ভাবটা যেন একবার একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া আসেন। কিন্তু অনন্ত হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"ঐটিই হচ্ছেন আমার—"

"কে হচ্ছেন—কে হচ্ছেন ?"

"গৃহিণী।"

"তাই না কি ? কই, কোন দিন ত তোমার সঙ্গে—"

"আমার সঙ্গে আসতে পছন্দ করেন না। স্ত্রীটিকে নিয়ে অশান্তির একশেষ মশায়! কি আর বোলবো আপনাকে। সময় সময় ধাঁধা লাগে—উনিই স্ত্রী, আমি স্বামী—না আমি স্ত্রী, উনি স্বামী।"

"তাই না কি—তাই না কি ? তা' হলে ত বড্ড—তোমার গিয়ে—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, বড্ডর চেয়েও বেশী। উঠবেন না, বসুন। আমি ওঁকে একটা কথা ব'লে আসি।"

স্ত্রীলোকটিকে অনন্ত জীবনে ইহার আগে আর দেখেও নাই। তিনি ফটক দিয়া বাহির হইয়া যাইবার পূর্ব্বেই অনন্ত পিছন হইতে কহিল—“মা-লক্ষ্মি, একটি কথা বলবো যে, জননি !”

স্ত্রীলোকটি ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। দূর হইতে বেঞ্চে বসিয়া এইবার রাধিকা বাবু তাঁহার মুখখানি দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন—সুন্দর—সুন্দর—অতি সুন্দর। তিনি তড়িৎগতিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং দু'এক পা আগাইয়া গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

স্ত্রীলোকটি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অনন্তকে কহিলেন, “কি বলবেন···বলুন।”

“বলছি কি, মা-জননি, এই গ্যালিফ্ ষ্ট্রীটের মোড়ে আমরা একটা ষ্টেসনারী দোকান খুলেছি। আপনাদের ব্যবহারের সব রকম সাবান, সেন্ট, ছেলেমেয়ের সোয়েটার, চা, বিস্কুট প্রভৃতি সব জিনিষই রেখেছি। দয়া ক'রে একটু পায়ের ধুলো দেবেন, মা-লক্ষ্মি! এইটুকু আমার নিবেদন।”

“গ্যালিফ্ ষ্ট্রীটের মোড়ে? আচ্ছা, কোনও কিছুর দরকার হ'লে নিশ্চয়ই যাব।”

স্ত্রীলোকটি ফটক পার হইয়া চলিয়া গেলেন। অনন্ত ফিরিয়া আসিয়া রাধিকা বাবুর পার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া কহিল—“ভাল আপদেই পড়া গেছে।”

মৃদু হাসিয়া রাধিকা বাবু কহিলেন—“স্ত্রীকে নিয়ে? হয়েছে কি?”

যাহা হইয়াছে, তাহার আনুপূর্ব্বিক ব্যাপার অনন্ত রাধিকা বাবুর কাছে কিছুমাত্র গোপন না করিয়া অকপটে বিবৃত করিয়া ফেলিল। অর্থাৎ

স্ত্রীটিকে লইয়া সে মহা বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। স্ত্রীর সঙ্গে তাঁহার মায়ের বনিবনাও নাই। তাই মা থাকেন দেশে আর স্ত্রীকে লইয়া তাহাকে এইখানে থাকিতে হয়। সম্প্রতি মায়ের ভয়ানক ইচ্ছা, দু'একটি তীর্থ ঘুরিয়া আসেন। তাই তাহাকে লইয়া এই মাসেই বাহির হইতে হইবে। কিন্তু স্ত্রী বলেন, তিনিও যাইবেন। অথচ লইয়া গেলে শাশুড়ী-বধূতে নিত্যই কলহ বাধিবে। তাই স্ত্রীকে কিছু না জানাইয়া গোপনে মাকে লইয়া পলাইতে হইবে।

রাধিকাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন - "উনি এখানে একলা থাকবেন ?"

"একলা থাকতেই উনি ভালবাসেন। তবে তেমন কোন জানা-শোনা ভাল লোক থাকতো, তাঁর অভিভাবকত্বে তাঁর বাড়ীর মেয়েদের কাছে মাসখানেক রেখে যেতুম। কিন্তু তেমন কেউ নেইও বটে, আর কে-ই বা আমার ঝক্কি নিতে স্বীকার হবেন ?"

"তু তোমার যদি উপকার হয়, তা'—ঝক্কি আর এমন কি। তোমার এই ক'দিনের আলাপেই ত আমি তোমাকে মনের ভেতর আপনার বলে জড়িয়ে ফেলেছি। একটা মাস না হয় আমার বাড়ীতেই রেখে যেও। সময়ের উপকারকে উপকার বলে না, অসময়ের উপকারই—"

আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া অনন্ত কহিল—"তা হ'লে ত চমৎকারই হয়। আপনার আশ্রয়ে যদি—। মাসখানেকের বেশী আমার ফিরতে লাগবে না।"

"তা যদি এক মাসের যায়গায় দু'মাসই হ'ল, তা'তে কি ?"

"আজ্ঞে, তা হ'লে ত—কি আর বোলবো। আপনার স্ত্রীর কাছে ও বেশ—"

"স্ত্রী আছে, আমার মেয়েরা আছে, নাতি-নাতনীরা সব আছে। বেশ থাকবেন উনি। কোন ভাবনা নেই।"

সে দিন রাধিকা বাবু অনন্তকে সঙ্গে করিয়া আপন গৃহে লইয়া গিয়া চা ইত্যাদি খাওয়াইয়া তবে ছাড়িলেন।

(৫)

দুই দিন পরে।

সন্ধ্যার পর রাধিকা বাবুর গৃহে বসিয়া উভয়ে কথোপকথন হইতেছিল।

"ব'লে ক'রে গেলে বুঝি তিনি কিছুতেই তোমার সঙ্গ ছাড়বেন না? আবার সঙ্গে নিয়ে গেলেও মায়ের সঙ্গে রোজই কোঁদল বাধবে? তা' হ'লে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর উপায় কি? তাই যাও। তা' হ'লে কালই যাবে—বলছ?"

"আজ্ঞে। কাল বিকেলে দেশে পৌঁছে, পরশু মাকে নিয়ে অমনি অমনি চ'লে যাব। আপনি কালই সন্ধ্যার সময় আমার ওখানে গিয়ে ওকে চিঠিখানা দেবেন। দিলেই প্রথমটা ও চমকে যাবে। তার পর আপনার সঙ্গে আপনার স্ত্রীর কাছে চ'লে আসবে।"

"তাই হবে। চিঠিখানা আর একবার পড় দেখি।"

অনন্ত হাতের চিঠিখানা পড়িল। তাহাতে এইরূপ লিখিয়াছিল :—

পরম শুভাশীর্ব্বাদ

ভোম্বর!

অফিসের একটা জরুরি কাযে হটাৎ ১৫ দিনের জন্য বাইরে যেতে হ'ল, তোমার সংগে দেখাও ক'রে যাবার সময় পেলুম না। যিনি পত্র নিয়া যাইতেছেন, তিনি আমাদের বড় বাবুর সম্বন্ধি। তুমি এ কটা দিন এঁদের বাসায় এঁর স্ত্রীর কাছে থাকবে। সুতরাং ঘরে তালা লাগিয়ে

তোমার কাপড়-চোপড় নিয়ে তুমি এঁর সঙ্গে চলে আসবে। কোন সন্দেহ বা দিধা করিবে না! ইঁনি পূজন্য ব্যেক্তি। সুতরাং শ্রোদ্ধা ভকৃতি করিবে। ইতি—

শ্রীবসন্তলাল রায়।

"তা হ'লে, বাসাটা হোল গিয়ে, ১৮ নং জয় মিত্তির রোড?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তা হ'লে, টাকা একশ'টা দিয়ে দি?"

"আজ্ঞে দিন। ফিরে এসেই দিয়ে দেবো। ঐ হাতে যে চুড়ি আছে দেখেছেন, ঐ চুড়ি বাঁধা রেখেই দিয়ে দেবো। আজ চাইতে গেলেই, আন্দাজে ধ'রে ফেলবে যে, বাঁধা দিয়ে, মাকে নিয়ে চ'লে যাব। বুঝলেন না?"

"তা বুঝেছি। কাল পার্কে ই আমি ধরবো এখন। তা হোলে, চিঠি-পত্তর মাঝে মাঝে দিও।"

"আজ্ঞে, তা দেব বই কি।"

আরও খানিকক্ষণ রাধিকা বাবুর সঙ্গে কথা কহিয়া—এক শতটা টাকা লইয়া অনন্ত চলিয়া আসিল। পথে আসিতে আসিতে মনে মনে বলিল—

"অপরাধ নিয়ো না দেবতা। পরের স্ত্রীকে দেখিয়ে নিজের স্ত্রী ব'লে পরিচয় দিয়েছি—খুবই অপরাধ হয়েছে। আর টাকা একশ'টা ফাঁকি দিয়েও নিলুম। পেটের দায় একরকম গেছে বটে, কিন্তু ষোল আনা যায় নি; তাই এ কায করতে হ'ল। মাপ চাচ্ছি, মাপ কোরো দেবতা।"

* * * *

দেশবন্ধু পার্ক।

বেলা অপরাহ্ণ। পকেটের ভিতর অনঙ্গর চিঠিখানা লইয়া রাধিকা বাবু মেয়েদের পার্কের বাহিরে একখানা বেঞ্চের উপর উৎকণ্ঠিত-চিত্তে বসিয়া আছেন। উৎকণ্ঠা ভোমরের জন্য।

অবশেষে ভোমর দেখা দিল। সঙ্গে আর একটি স্ত্রীলোক। রাধিকা বাবু তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া দ্রুতপদে তাহাদের সম্মুখে গিয়া হাজির হইলেন। হি-হি করিয়া হাসিয়া, ভোমরের মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন—"বসন্ত চ'লে গেল।"

স্ত্রীলোক দুইটি অবাক্। পাগল ভাবিয়া তাহারা অগ্রসর হইয়া চলিল। রাধিকা বাবু তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন, কহিলেন—"শোন না গো, মিথ্যা কথা নয়, সত্যিই বসন্ত চ'লে গেছে।"

যিনি ভোমর, তিনি এই জঘন্য লোকটার ইতরামীতে বিরক্ত হইয়া চলিতে চলিতে কহিলেন—"এইবার বর্ষা নেবে তোমায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে পাজি, চুলো কোথাকার।"

রাধিকাবাবু নাছোড়বান্দা। হিহি করিয়া হাসিতে হাসিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তখন অপর স্ত্রীলোকটি মিলিটারীর মত ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"তোমার বদমায়েসী ঘুচিয়ে দেবো এক্ষনি, রাস্‌ক্যাল, হুমবগ, কোথাকার!" রাধিকা বাবু অপ্রস্তুত হইয়া বোকার মত হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহারা লেডিস পার্কের মধ্যে চলিয়া গেল।

কিন্তু রাধিকা বাবুর অসীম ধৈর্য্য। সহজে ছাড়িবেন না। তিনি সেইখানে 'লনের' উপর পাইচারী করিতে লাগিলেন। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে আবার যখন তাহারা পার্কের ভিতর হইতে বাহিরে আসিল, তিনি

[illegible] তাহাদের সম্মুখে হাজির হইলেন এবং হাতের চিঠিখানা দেখাইয়া কহিলেন,—"তোমার নামে চিঠি আছে,—বসন্ত দিয়েছে। সে অফিসের—"

"পুলিস্…পুলিস্!"

স্ত্রীলোকদ্বয় উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল—"পুলিস্! পুলিস্!"

দেখিতে দেখিতে ভীড় জমিয়া গেল। লোকে লোকারণ্য! সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া সকলে রাধিকা বাবুকে নানারূপ অকথা-কুকথা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতে লাগিল। দু' একটা ঢিল-ঢেলাও তাঁহার গায়ে বর্ষিত হইল। কে একজন হোয়াক্ করিয়া এক থাবড়া পাণের পিক তাঁহার গায়ে নিক্ষেপ করিল। এক জন মহিলা একটু তফাৎ থেকে বলিলেন—"লোকটার মাথায় বরফ-জল ঢেলে দিন, মাথাটা তা'হলে ঠাণ্ডা হ'বে!" একটি ছোকরা বলিল,—"প্রেম-জ্বরে [illegible]র-জ্বর, শুধু বরফ-জল নয়—বরফ-ঘোল ঢাল।" আর একজন কে বলিল—"আচ্ছা ক'রে ঘা কতক—"

সন্ধ্যা হইয়াছিল। ভীড়ের প্রান্তে একটু দূরে দাঁড়াই[illegible] র‍্যাপার মুড়ি দিয়া একটি লোক তাহার সঙ্গীর হাত ধরিয়া [illegible] নীরবে মজা দেখিতেছিল। সঙ্গীর হাত টানিয়া ধরিয়া সে কহিল—"চ'লে এস—চ'লে এস।"

সঙ্গী কহিল—"ব্যাপার কি, বল দেখি?"

"ব্যাপার—বুঝলে না?—প্রেমের দায়।" জগতে যত কিছু অপকর্ম্ম হয়, দেখছি তার মূলে—হয় পেটের দায়, নয় ত প্রেমের দায়'

লোকটি বসন্ত।

নীল কাগজের মোড়ক

(১)

মোড়ার দিকের অনেক কথাই বলিতে পারা যায়; কিন্তু তাহা সব বলিতে গেলে অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পড়িবে, কিন্তু কিছু না বলিলেও প্রসঙ্গটা বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইবে না।

বর্তমানের শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন অতীতে যখন শ্রীমান্ রেবতী ছিল [illegible]ন তাহার বয়স ছিল পঁচিশ কি ছাব্বিশ, তখন তাহার বৃদ্ধ পিতা তাঁহার বিবাহ দিবার জন্য কনে খুঁজিতে খুঁজিতে হঠাৎ গেলেন মারা। সুতরাং কাযটা ঐখানেই বন্ধ হইয়া গেল। অর্থাৎ পিতার মৃত্যুর পর বিয়ের জন্য ব্যস্ত না হইয়া, রেবতীমোহন তখন হইতে বৈষ্ণব-গ্রন্থাবলী লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িল। কনে খোঁজার বদলে, সে তখন ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, বৈষ্ণবপদাবলী প্রভৃতি খোঁজাখুঁজি সুরু করিতে লাগিল। এই ভাবে বছর দশেক কাটিবার পর যখন তাহার বৃদ্ধা জননীও তাহার আলোচনা এবং গবেষণার মধ্যে তাহাকে একলা ছাড়িয়া দিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন, তখন রেবতীমোহনের বহুদিনের পতিত

হৃদয়ক্ষেত্রে হঠাৎ কোথা হইতে প্রেমের বীজ পড়িয়া অঙ্কুরিত ও সঙ্গে সঙ্গেই তাহা তরুর আকার ধারণ করিয়া ফলে-ফুলে মুঞ্জরিত হইয়া উঠিল। শ্রীযুত রেবতী তখন বাধ্য হইয়া কিছুদিনের জন্ম তাহার গ্রন্থ-গবেষণা স্থগিত রাখিয়া; স্ত্রী অন্বেষণে মনোযোগ দিল। ক্ষেত্রে নামিয়া রেবতী-মোহন দেখিল, বঙ্গদেশে বন্যা-প্রবাহের ন্যায় কন্যা-প্রবাহ বর্ত্তমান। তাহার অনুসন্ধিৎসু চক্ষু চারিদিকে একবার ফিরাইতেই রাশি-রাশি কুমারী কন্যার সংবাদ তাহার নিকট আসিয়া পড়িল। রেবতীমোহন অতি যত্নে তন্মধ্য হইতে বাছিয়া লইল ফরিদপুর নাজির পাড়ার শ্রীমতী নবদুর্গা দাসীকে। সেই সময় নবদুর্গার বয়স কুড়ি এবং রেবতীর বয়স ছাব্বিশ আর দশ অর্থাৎ ছত্রিশ।

বিবাহের পর একটি যুগ কাটিয়া গিয়াছে। সুতরাং এখন শ্রীমতী নবদুর্গা কুড়ি ছাড়াইয়া—এ দেশের হিসাবে বত্রিশ বছরের বুড়ী হইয়াছে এবং রেবতীমোহনকেও ঊনপঞ্চাশীতে ধরি ধরি করিতেছে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে উভয়ের সুখের অপেক্ষা দুঃখে, শান্তির অপেক্ষা অশান্তিতে এবং ভাবের অপেক্ষা অ-ভাবেই কাটিয়াছে। কোথায় কিছু [illegible] 'শুভদৃষ্টির' সময় অজ্ঞাতে ঘটিয়া গিয়াছিল, কোথায় কি একটু কোষ্ঠীর [illegible] ত গরমিল ছিল, যাহার ফলে এই দ্বাদশ বৎসরকাল ধরিয়া উভয়ের মধ্যে কলহের আর কামাই নাই। সেদিন নবদুর্গা স্বামীর অজ্ঞাতে এক জন দাড়িওয়ালা পাগড়ী-বাঁধা পাঞ্জাবী গণৎকারকে ডাকিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। পাঞ্জাবীটি গণিয়া বলিয়াছিল যে, অষ্টোত্তরশতবার কলহের পর তবে কলহের নিষ্কৃতি হইবে। কতবার ঝগড়া হইয়াছে, তাহার একটা সঠিক হিসাব নবদুর্গার কাছে আছে। নবদুর্গা দেখিল,

একশ ছয়বার হইয়া গিয়াছে, আর তাহা হইলে দুইটিবার মাত্র বাকী। উভয়েরই অন্তরে এই দ্রব্যটির প্রবৃত্তি এরূপ প্রবল যে, আর মাত্র দুইটি-বারেই তাহার নিবৃত্তি হইবে, ইহা ভাবিতে বিস্ময়ে ও সংশয়ে মন ভরিয়া উঠে।

যাহা হউক, বাকী দুইটির মধ্যে একটির শুভঘটনা সেই দিনই মহা সমারোহে সংঘটিত হইল। কারণটি খুব তুচ্ছ হইলেও ঝগড়াটি হইল খুব উচ্চশ্রেণীর। রাত্রিতে খাইতে বসিয়া রেবতী তরকারীতে হাত দিয়া কহিল, এটা কিসের তরকারী গা? নবদুর্গা কহিল, ঝিঙে পোস্ত।

মুখটা বিকৃত করিয়া রেবতী কহিল, আবার ঝিঙে? যেন একটা অখাদ্য বললেই হয়, সেইটেই রোজ রাঁধবে? কথায় বলে—

'পাখীর ওঁচা ফিঙে,

আর তরকারীর ওঁচা ঝিঙে।'

একটু শ্লেষের ফোড়ন দিয়া নবদুর্গা কহিল, ঝিঙেটা আমি একটু বেশি ভালবাসি—সেই জন্যে ঐ কার্ত্তিক মালীকে একটা ঝিঙে-ক্ষেত করতে বলেছি। তা যত দিন না সেটা তৈরী হয়, তত দিন এই রোজ মোটে আড়াই-সের করে বাজার থেকে—

রেবতী কট্‌মট্ করিয়া নবদুর্গার দিকে চাহিয়া রহিল।

নবদুর্গা একটু বিষাক্ত হাসি হাসিয়া কহিল, ভস্ম করবে না কি?

ভস্ম তুমি হোতে পারলেই তোমার পক্ষে ছিল ভাল? তা হোলে আর রোজ দুবেলা এই ছাই-ভস্মগুলো আমাকে খেতে হোত না। বলিয়া ঝিঙের তরকারিটা রেবতী থালা হইতে মাটীতে ফেলিয়া দিল।

নবদুর্গার সর্ব্বশরীর রাগে রি-রি করিয়া উঠিল। কহিল, রান্নাটা

চাল থেকে নিজেই তা হোলে কোরো। আমি আর পারব না। আমি ত রাঁধুনী হিসেবে মাস-মাইনেতে বাবু-সাহেবের সংসারে আসি নি!

খোঁয়া হইতে দপ্ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

ভাতশুদ্ধ থালা উল্টাইয়া ফেলিয়া দিয়া, তরকারিটা নবদুর্গার গায়ে ছুঁড়িয়া দিয়া, দুধের বাটিটায় লাথি মারিয়া রেবতী গর্জ্জাইল, তাই এনেছি—তাই এনেছি—তাই এনেছি।

সমস্ত ঘরখানা ভাতে, তরকারিতে, দুধে, জলে একাকার হইয়া গেল। বাড়া ভাত আর রেবতীর পেটে গেল না। হাত ধুইয়া আসিয়া সে আলো নিভাইয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল। নবদুর্গাও অভুক্ত থাকিয়া, মেঝের একধারে স্বতন্ত্র শয্যা রচনা করিয়া শুইয়া পড়িল।

কয়েক দিন হইল ফরিদপুর হইতে নবদুর্গার পিতামহী তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। নবদুর্গার কনিষ্ঠ সহোদর নিশিকান্ত ওকালতী উপলক্ষে কলিকাতার শ্যামবাজারে বাসা করিয়া থাকে। নবদুর্গার বাসায় পাঁচ সাত দিন থাকিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া এখন তিনি সেইখানে [illegible] আছেন। কয়েক দিন সেখানে থাকিয়া দেশে চলিয়া যাইবেন, ১০৭ নম্বরের ঝগড়াটার ওজন বেশ একটু ভারি গোছেরই হইয়াছিল; সুতরাং তাহার ভারে পরদিন নবদুর্গা ভাইয়ের বাসায় চলিয়া গেল এবং সেখান হইতে পিতামহীর সঙ্গে একবার ফরিদপুর গিয়া হাজির হইল।

আষাঢ় মাসটা রাগের উপরই কাটিল। শ্রাবণ মাসের গোড়াতেই রেবতী নবদুর্গাকে পত্র দিল। তাহাতে লিখিল —৩২ বছর বয়সেও তোমার ছেলেমানুষী গেল না। ঘর-সংসার করতে গেলে একটু-আধটু

কথা-কাটাকাটি হয়ই। দুটো বাসন এক যায়গায় থাকলে ঠোকাঠুকি লাগেই, তাই বোলে কি রাগ করে সাত-সমুদ্দুর তের নদী পার গিয়ে আমায় কাঁদিয়ে ব'সে থাকতে হয়? ধন্য তোমায়, দুর্গা! তোমার কঠিন প্রাণটাকেও ধন্য! আমি শয়নে-স্বপনে তোমাকেই খালি ভাবছি। আর পাগলামী কোরো না। সামনে ভাদ্র মাস; সুতরাং শীঘ্রই চলিয়া আসিবে।

নবদুর্গারও আসিবার জন্য প্রাণ ছটফট করিতেছিল। সে নিজের মনে বলিল, বাস্তবিক চ'লে আসাটা ভাল হয় নি। ১০৮ বার ঝগড়া ত হবেই! এ যখন বিধির বিধান, তখন এতে ত আর কারও হাত নেই। যা হোক, আর একবার বাকী। এবার কোন রকমে চোখ-কাণ বুজে চুপ ক'রে থাকব।

একটা ভাল দিন দেখিয়া নবদুর্গা কলিকাতা চলিয়া আসিল। ঠাকুরমা সঙ্গে কিছু আমচুর আর আমসত্ব দিয়াছিলেন। সেইগুলির কিছু ভাইকে দিবার জন্য শিয়ালদ' হইতে চেতলা না গিয়া বরাবর শ্যামবাজারে ভাইয়ের বাসাতেই নবদুর্গা আসিল। তোরঙ্গের মধ্য হইতে আমচুর ও আমসত্বগুলি বাহির করিল, ভাই নিশিকান্ত জিজ্ঞাসা করিল, ও কাঁথাখানা কিসের দিদি? নবদুর্গা কহিল, তলায় লেগে আমসত্বগুলো খারাপ হয়ে যাবে ব'লে তোরঙ্গের নীচে ঠাকুরমা ওখানা পেতে দিয়েছিল। ঞং বহুকালের কাঁথা—ঠাকুরমার ছেলেবেলাকার। তার নিজের হাতের তৈরী।

নিশিকান্ত কহিল, বহুকালের যে, তা ত দেখেই জানা যাচ্ছে। কিন্তু নতুন বেলায় বেশ ছিল ত?

হ্যাঁ। ভারি সূক্ষ্ম কারিকুরি। দাদামশাই না কি এই কাঁথা গায়ে দিয়েই কত বড় বড় জায়গায় যেত। তুই রাখিস ত রাখ্। কিন্তু এতে আর কিছু পদার্থ নেই; যেখানে ধরবি, সেইখানেই খসে পড়বে; নইলে আর ঠাকুমা তোরঙ্গের তলায় পেতে দিয়েছে?

অতি সন্তর্পণে কাঁথাখানা ধরিয়া নিশিকান্ত দেখিতে লাগিল।

কয় দিন হইতে একটি লোক রেবতীর কাছে আসা-যাওয়া করিতেছে। মনে হয়, যেন ঐ লোকটি কোন দ্রব্য বিক্রয় করিবে এবং রেবতী তাহা কিনিবে। বিক্রেয় বস্তুটি কোন জমি-যায়গা নয়, কোন বাড়ী-ঘরও নয়, কিম্বা কোন বাগান, পুকুর, গরু, ছাগল, আলমারি দেরাজ, ঘড়ি, বই, ছাতা, ছড়ি, গদি, তোষক, বাসন-কোসন, চাল-ডাল, দুধ-ঘি, কয়লা-ঘুঁটে, টিকে-তামাক প্রভৃতি কোন দ্রব্য নয়। হাতখানেক লম্বা, মোটা নীল কাগজে জড়ান ছোট একটা মোড়ক। বস্তুটি তাহারই মধ্যে সযত্নে রক্ষিত। বোধ হয়, আসন্ন পূজার উপহারস্বরূপ নবদুর্গার জন্য কোন স্বর্ণালঙ্কারের পেটিকা। নেকলেস্, কি হার কি আর কিছু। কিম্বা তাহার জন্য কোন মূল্যবান সাড়ী, কি ব্লাউজ ! কিন্তু—না না, তাহা ত নহে ! তাহাই যদি হইবে, তাহা হইলে তাহা নবদুর্গার সম্মুখে না আনিয়া তাহাকে না দেখাইয়া, এইরূপ গোপনে দেখাশুনা এবং দরকষাকষি কেন হইবে? তাহা হইলে কি কোন চোরাইমাল ; গোপনে আনিয়া, গোপনে বসিয়া, গোপনে গোপনে তাহার দর-দস্তুর হইতেছে ?

যাহাই হউক, দুই দিন আনা-গোনার পর তাহার মূল্য স্থির হইয়া গেল এবং রেবতী নগদ এক শত এক টাকা দিয়া দ্রব্যটি ক্রয় করিয়া তাহা পরম ভক্তিভরে মাথায় ঠেকাইল। লোকটিকে কহিল, একখানা রসিদ দিতে হবে। লোকটি রসিদ দিলে, সেখানিও ঐ মোড়কের মধ্যে রাখিয়া

আর একবার তাহা মাথায় ঠেকাইয়া আপাততঃ বৈঠকখানারই একস্থানে অতি যত্ন সহকারে রেবতী রাখিয়া দিল।

সন্ধ্যার পর রেবতী নবদুর্গাকে কহিল, আজ একটি অমূল্য দ্রব্য কিনেছি।

নবদুর্গা কহিল, কি? রাগের ওপর আবার রাগিনী-টাগিণী কিছু যোগাড় ক'রে ফেল্লে না কি? শুধু রাগে হয় ত আর কুলুচ্ছে না।

রেবতী কহিল, ঠাট্টা নয়; দুষ্প্রাপ্য জিনিষ—অমূল্য বস্তু। এ দ্রব্য ঘরে থাকলে আর ঝগড়া-ঝাটি, দুঃখু-অশান্তি কিছুই থাক্‌বে না, দুগ্‌গা! কিন্তু এখন আর বল্‌ছি না, পরে বোল্‌বো। আমার বহুদিনের সাধ যে হঠাৎ এমন ভাবে—

বহুদিনের সাধ ত তোমার একখানা বাড়ী কেনা। কিনলে না কি?

কলকাতায় বাড়ী কেনা কি আর আমার হয়ে উঠবে? আমার দু'চার হাজার পুঁজিতে আর এখানে বাড়ী করার আশা নেই। অথচ, চিরকাল ধ'রে এই রকম ভাড়া করেও আর আমি থাকছি না। ভূতের নাতির মত বাসাড়ে নাম আমি শীগ্‌গীরই ঘোচাব।

ভূতের নাতি মানে?

ভূতের নাতি মানে, একটা কথা আছে জান না?

আবাগের বেটা ভূত।
ভূতের বেটা—বিতিকিচ্ছি।
বিতিকিচ্ছির তিন ছেলে—
চোয়াড়ে, জোয়াড়ে, আর বাসাড়ে।

নবদুর্গা কহিল, তা হ'লে বাড়ী করবে কোথায়?

কোল্‌কাতায় বাইরে কোথাও। মনে করছি, হয় নবদ্বীপ, নয় অন্ততঃ খড়দ'।

ও-সব যায়গায় আমি থাকতে পারব না, তা কিন্তু আগে থাকতেই ব'লে রাখছি।

কেন? অপরাধ?

অপরাধ-টপরাধ জানি না; তবে মানে—কথা হচ্ছে, যে, সে আমি থাক্‌তে পারব না। পাড়া-গাঁ; জল-কাদা, বন-জঙ্গল—

কিন্তু, কথা হোচ্ছে যে, চৌরঙ্গীতে কি গড়ের মাঠে বাড়ী করবার মত ত টাকা আমার নেই;—রেবতীর কণ্ঠ একটু তীব্র এবং চক্ষুর্দ্বয় অপেক্ষা-

নবদুর্গা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া কহিল, পালাই বাবা এখান থেকে, এই নিয়েই হয় ত এখনই কুরুক্ষেত্রকাণ্ড বাধবে। বলিয়া দালানের দিকে চলিয়া গেল; যাইতে যাইতে কহিল, সেই অমূল্য বস্তুটি এই বেলা শীগ্‌গির একটুখানি গুলে খেয়ে ফেল।

রেবতী তাহার পিছন পিছন আসিয়া অতি মৃদু অতি মোলায়েম, এবং অতি অদ্ভুত ভঙ্গীতে কহিল, ফরিদপুরে নাজিরপাড়া বলে যে গ্রামটা আছে, সেটা বোধ হয়, বালীগঞ্জ এভেনিউ বা লেক রোডের ওপরে নয়। সেখানে বোধ হয় যথেষ্ট বন-জঙ্গল এবং জল-কাদা। আর রাস্তা সেখানকার পিচ ঢালা নয়। আর তার দু'ধারে সন্ধ্যার পর ইলেকট্রিক্ জ্বলে না।

অনুরূপ ভঙ্গীতে নবদুর্গা কহিল, জন্মভোর সেখানে ত আমার কাটেনি! কেটেছে এইখানেই। তা কাটুক আর না কাটুক, আমি কলকাতা ছেড়ে কোথাও গিয়ে থাকতে পারব না; স্পষ্ট কথা।

থাকতে পারবে না?—রেবতীর চোখের দৃষ্টি ও মুখের ভিতর দিয়া যেন আগুন ছিট্‌কাইল।

না, পারব না। বলিয়া নবদুর্গা দালান হইতে আবার শয়নঘরের জানালার ধারে আসিয়া বসিল। পিছন পিছন রেবতীও আসিয়া দাঁড়াইল। ঝড়ের পূর্ব্বলক্ষণ। তাহার ভাব—গুরু-গম্ভীর; মুখে কথা নাই; ঝড় উঠিল বলিয়া।—ব্যাপার দেখিয়া নবদুর্গা কহিল, তোমার মৎলবখানা কি শুনি?

কট্‌মট্‌ করিয়া নবদুর্গার মুখের দিকে চাহিয়া রেবতী জিজ্ঞাসা করিল, খড়দায় গিয়ে যদি থাকি, তা হলে তুমি সেখানে গিয়ে থাকতে পারবে না?

না।

বলি, তুমি আমায় বিয়ে করেছ—না, আমি তোমায় বিয়ে করেছি?

দু'জনেই দু'জনকে বিয়ে করেছি।

সহসা ঘর ফাটাইয়া রেবতী চীৎকার করিয়া উঠিল, বলি—আমি স্বামী, না—তুমি স্বামী?

মুখখানা বিকৃত করিয়া নবদুর্গা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তুমি খড়দার গো-স্বামী।

ঝড় উঠিল।

রেবতী ক্ষিপ্তের মত সমস্ত ঘরের মধ্যে ছুটাছুটি করিয়া এটা-ওটা-সেটা টানিয়া টানিয়া মেঝের উপর ছুড়িয়া ফেলিতে লাগিল। বিছানার বালিশ ফেলিল, চাদর ছিঁড়িল, আলো ভাঙিল, ফুলদানী উল্টাইয়া দিল, স্যুটকেশ ধরিয়া আছাড় মারিল, আলনা হইতে নবদুর্গার কাপড় লইয়া তাহা ফালা-

ফালা করিয়া ছিঁড়িল; তারপর দেরাজে দুই চারি বার লাথি মারিয়া, ধড়াস্ করিয়া সশব্দে ঘরের দরজায় একটা ধাক্কা দিয়া, বাসা হইতে বাহির হইয়া গেল।

দালানের দেওয়ালে ঠেসান দিয়া বসিয়া নবদুর্গা মনে মনে হিসাব করিল, এই হ'ল—১০৮।

(৩

১০৮এর পর এক সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও উভয়ের মধ্যে বাক্যালাপ হয় নাই। নবদুর্গা ঘরের কায-কর্ম্ম করে, রাঁধে-বাড়ে, রেবতীকে দেয়, নিজে খায়; তারপর মেঝের একধারে পৃথক শয্যা পাতিয়া শুইয়া পড়ে। আর রেবতী প্রায় সারাদিনই বাহিরের বৈঠক-খানাঘরে কাটায়, সেইখানেই কোশা-কুশী লইয়া জপ-তপ করে, পদাবলীর বই পড়ে, আর ভাবে। ভাবে যে, নবদ্বীপে যদি পাঁচ-সাতশ টাকার মধ্যে সুবিধামত কোন বাড়ী কিনতে পাই, তাহা হ'লে চমৎকার হয়। সুন্দর যায়গা। পবিত্র স্থান। জিনিষ-পত্র সস্তা। জীবনের শেষ দিনে পর্য্যন্ত দিব্য সুখ-শান্তিতে তা'হলে কেটে যাবে।

পরক্ষণেই ভাবে—কিন্তু তা কাটবে কি? 'আমি যাই বঙ্গে—আমার কপাল যায় সঙ্গে'। যে স্ত্রীটি আছেন, তাঁকে নিয়ে নবদ্বীপ ছেড়ে আস্তিপুর গিয়ে থাকলেও শান্তি পাবার জো নেই!—আবার কখনো ভাবে, নবদ্বীপে যদি সুবিধে না হয়ে ওঠে, তা হ'লে—খড়দা। একটা সমাজ যায়গা! কলকাতাও কাছে হবে। দিব্য গঙ্গার ধার। চমৎকার শোভা, সকাল বিকেল গঙ্গার ধারে এসে বসলে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে!

বাবু, চিঠি আছে

দুপুরবেলা আহারাদির পর রেবতী বৈঠকখানায় শুইয়া ঐ রকম

সাতপাঁচ চিন্তা করিতেছিল, সেই সময় পিয়ন আসিয়া একখানি পত্র দিয়া গেল। পত্রখানা পড়িয়া আনন্দে তাহার হৃদয় নাচিয়া উঠিল। মহা সুখবর! মৃত্যুসংবাদ!

নবদুর্গার পিতামহীর মৃত্যু হইয়াছে।

সঙ্গে সঙ্গেই রেবতী হিসাব করিয়া ফেলিল, তিন বছর অর্থাৎ ৩৬ মাসে ৩৬ টাকা প্রিমিয়ম দেওয়া হইয়াছে, অন্ততঃ শ'চুই টাকা ত পাওয়া যাইবেই।

ব্যাপারটা এই যে, নবদুর্গার পরামর্শে তাহার বৃদ্ধা পিতামহীর নামে কি একটা ইন্‌সিউর‍্যান্স কোম্পানীতে আজ বছর তিন হইল, 'ডেথ্ বেনিফিট' ইনসিওর করা হইয়াছিল। নবদুর্গাকে 'নমিনি' করিয়া রেবতী মাসে মাসে একটা করিয়া টাকা এই তিন বৎসরকাল যোগাইয়া আসিতেছে। বুড়ী মরিলে পর একটা মোটা টাকা, অর্থাৎ দুই শ'য়ের কম নয় এবং পাঁচ শ'য়েরবেশী নয়—নবদুর্গার অর্থাৎ রেবতীর হস্তগত হইবে। সেই শুভক্ষণ আজ উপস্থিত। সামনে পূজা। এই সময় এই রকম একটা দাঁও—। রেবতী যাহা ভাবিতেছিল, সে সব কথা ভুলিয়া গেল। মনের আনন্দ মনে লুকাইয়া, মলিন মুখে সে তখনি, যেখানে নবদুর্গা বসিয়া সুপারি কুঁচাইতেছিল, সেইখানে আসিয়া চিঠিখানা তাহার কোলের উপর ফেলিয়া দিল; কহিল, নাজিরপাড়া থেকে এসেছে।

চিঠিখানা পড়িয়া নবদুর্গার চোখ ছলছল্ করিয়া উঠিল। রেবতী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, ভগবান্ কখন্ যে কাকে হঠাৎ টান্ দিয়ে টেনে নেন্, তা আর বোঝবার জো নেই। এই ত তাঁর জগৎ! সবই

বৃথা—ছুটো-ছুটি, লাফালাফি, বকাবকি, রাগা-রাগি—মানুষের এ সব কতক্ষণের জন্যে! আহা, বুড়ী ছিল, তবু—। অন্যদিকে রেবতী মনে মনে হিসেব করিতে লাগিল, দুশোর বেশীও পাওয়া যেতে পারে। দু'শ' থেকে পাঁচ শ'র মধ্যে। তা দু'শোও পেতে পারি, তার বেশীও পেতে পারি। ভগবানের কি দয়া! সেদিনকার ১০১ টাকা সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তুলে দেওয়ালেন। জয় গুরু!

কোলের উপর সুপারি ও জাঁতি রাখিয়া নবদুর্গা শাড়ীর আঁচলে ঘন ঘন চোখ মুছিতে লাগিল। রেবতী বিমর্ষ মুখে এক পা এক পা করিয়া চলিয়া আসিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল।

দিন চার পাঁচ পরে রেবতী নবদুর্গাকে কহিল, পূজোয় এবার কি কাপড় তোমার পছন্দ বল? আর ব্লাউজ সেদিন একটা দোকানে যা দেখে এসেছি, তেমন আর দেখি নি। ভারি চমৎকার। সেই ব্লাউজ একটা তোমার জন্যে আমি কিনবোই। তোমাকে মনোমত ক'রে সাজাতে আমার যে কত সাধ, তা আর কি বলব তোমায়, দুর্গা। তুমি ত বুঝতে পার না যে, এই এতবড় বুকখানার সবটাই তুমি জুড়ে আছ।—ক'দিন হোল, তোমার চেহারাটা যেন একটু খারাপ হয়েছে। স্নান ক'রে মিছরির সরবৎ বোধ হয় খাও না? খেও একটু করে। নিজের শরীরটার ওপর একটু লক্ষ্য রেখো। আমাকে আর ভাবিয়ে তুলো না। যাক্, কি কাপড় এবার তোমার কিনবো বল দেখি?

নবদুর্গা কহিল, এবার তোমার টানাটানি, এবার আমার জন্যে আর তোমায় বিশেষ কিছু খরচ করতে হবে না। তোমার শরীরটাও যেন আগের চেয়ে খারাপ হয়ে গেছে। এত ক'রে বলি, আধসেরের ওপর

আর এক পো করে দুধ খাও, তা ত কিছুতেই খাবে না তুমি! তোমাকে নিয়ে কি মুস্কিলেই যে পড়েছি আমি!

রেবতী হর্ষ-গদগদ স্বরে কহিল, জগতে স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধ যে কি মধুর, কত ঘনিষ্ঠ, তা কি সকলে বোঝে? স্বামীর স্ত্রী আর স্ত্রীর স্বামী, এ ছাড়া জগতে আর কে আছে? একটা পরের মেয়ে আর একটা পরের ছেলে—কি ক'রে যে এমন এক হয়ে মিশে যায়, আমি তাই ভাবি।

নবদুর্গা কহিল, সকলেরই কি তাই হয়? আমরা মনে করেছি, সব স্বামি-স্ত্রীই আমাদের দু'জনের মত পরস্পর পরস্পরকে এই রকম ক'রে ভালবেসে এই রকম প্রাণে প্রাণে মিশে এক হয়ে আছে। কিন্তু তাই কি? যাক্,—এবার আর আমার জন্যে তোমাকে এক পয়সাও খরচ করাব না। যা হোক, কিছু আমি পাব ত?

কোত্থেকে?

কেন, ঐ ঠাকুমার দরুণ টাকাটা?

রেবতী যেন একটা হঠাৎ ধাক্কা খাইল। বলিল, কি বলছ, কিছু বুঝলুম না।

বলছি যে, আমি ত 'নমিনি'। সুতরাং যা পাবার, সে ত আমিই পাব। তুমি যে ৩৬৲ টাকা দিয়েছ, সেইটে তোমার দিয়ে যা থাকবে, তাই থেকেই এবার সাড়ী ব্লাউজ কিনবো। তার পর যা থাকবে, সেটা আমার থাকবে।

থাকবে?

হ্যাঁ।

এক মিনিট রেবতী চুপ করিয়া রহিল। তার পর দেখিতে দেখিতে

তাহার মুখখানা যেন ফুলিয়া উঠিল, চোখ দুইটা উজ্জল হইল। গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল, বুড়ীর দরুণ ও টাকাটা তোমার, না?

আমার নামেই ত আছে।

তা হোলে, ওটা তোমারই ত?

হ্যাঁ, আমার।

একটা বিকৃত, দুষ্ট হাসি হাসিয়া রেবতী কহিল, তা হোলে ঐ গলার হারছড়াটা—ওটা তোমার? ওই অনন্ত-জোড়াটা—ওটাও তোমার? ঐ চুড়ি ক'গাছা, ঐ বালা, ঐ কাণের দুল, আলমারীভরা সব কাপড়-চোপড়—সবই তোমার? তুমি ঐ সব ব্যবহার কর ব'লে—ঐ সবই তোমার? এই বিছানাতোমার? ঐ সব ঘটি-বাটি, বাসন-কোসন, বাক্স-তোরং, চেয়ার-টেবিল, আলমারি—সব তোমার?—বলিতে বলিতে সহসা গলার আওয়াজ একেবারে পঞ্চমে তুলিয়া রেবতী চীৎকার করিয়া উঠিল বল না; চুপ ক'রে ব'সে রইলে কেন? ব্যবহার কর ব'লে এ সমস্ত কি তোমার?—রেবতী শেষ কথাটায় এরূপ ভীষণ গর্জ্জন করিয়া উঠিল যে, মনে হইল, ঘরের ছাদ বুঝি বা ফাটিয়া গেল।

নবদুর্গা সেই পাঞ্জাবী গণৎকারকে মনে মনে গালি দিয়া, মনে মনেই তাহার উদ্দেশ্যে কহিল, মুখপোড়ার গোণার মুখে ছাই। আর একবার তাকে দেখতে পাই ত মুখেও তার খানিকটা উনুনের ছাই দিয়ে দি।

অর্থাৎ ১০৮ ছাড়াইয়া, আজ হইল ১০৯।

নবদুর্গাকে নীরব থাকিতে দিল না। রেবতী ভীষনাদে গর্জ্জাইল, তোমার-তোমার-তোমার। আমার-আমার-আমার!—তার পর তীব্র

স্নেহের সহিত ব্যঙ্গচ্ছলে বলিল, কি গো, তুমি ভাল আছ ত, নবদুর্গা? এই আমি—রেবতীমোহন বেশ ভাল আছি; তুমি কোন দেশ থেকে আসছ? আমি আসছি সেই আমীরনগর থেকে! তুমি-তুমি-তুমি, আমি-আমি-আমি? তোমার-তোমার-তোমার! আমার-আমার-আমার।

উঠিয়া দাঁড়াইয়া নবদুর্গা কহিল, একেবারে যে উন্মাদ হয়ে উঠলে? রক্ষে কর, টাকা আর আমি চাই না; আমার চৌদ্দ পুরুষের ঘাট হোয়েছে! উঃ! কি সাংঘাতিক রাগ রে বাবা! আমার পূজোর কাপড়-ব্লাউজও চাই না, টাকাও চাই না। কিছু চাই না।

লাফাইয়া উঠিয়া রেবতী বলিল, তা কি হয়? টাকা যে তোমার! তোমার যে ঠাকুমা-মরা টাকা। আমাকে খালি ৩৬ টাকা দিয়ে দিলেই হবে'খন। আর তার সঙ্গে আড়াই পয়সা সুদ। টাকা এনে কোথায় রাখবে? তোমার বাক্সে, না আমার বাক্সে? হাঃ হাঃ হাঃ! তোমাদের বাড়ী কোথা? আমাদের বাড়ী সেই নবদ্বীপ—খড়দা!

নবদুর্গা রান্নাঘরে পালাইয়া গেল। যাইতে যাইতে বলিল, মাথায় একটু পেঁকো পুকুরের জল ঢেলে ঠাণ্ডা কর। গতিক খারাপ!

চোখ-মুখ লাল করিয়া রাগে ফুলিতে ফুলিতে রেবতী রান্নাঘরের দিকে ছুটিল। তাহার পর যে কাণ্ড হইল, তেমন বোধ হয় দু'এক মাসের মধ্যে ঘটে নাই। ঝগড়া-ঝাটি করারও যেমন শক্তি আবশ্যক, তা শোনারও তেমনি শক্তির দরকার। রেবতীর ঝগড়া শুনিতে আর আমাদের শক্তি নাই। সুতরাং সে দিনের কাণ্ডর কথা আর নাই-বা বলিলাম। তবে এইটুকু বলার দরকার যে, সেই দিনই বৈকালে ট্যাক্সি

আনাইয়া নবদুর্গা শ্যামবাজারে তাহার ভাইয়ের বাসায় চলিয়া গেল এবং রেবতীও পরদিন প্রত্যূষে সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার সঙ্কল্প করিল।

৪

রাত্রিতে রেবতী কিছু না খাইয়া যখন শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল, তখন হইতে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার নিদ্রা আসিল না। সে শুইয়া থাকিয়া নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিল। রাগের ভাবটা যদিও তাহার কমিয়া আসিয়াছিল বটে, কিন্তু বিরাগের ভাবটা সেইখানে এখন জাঁকিয়া বসিল। রেবতী ভাবিল, সংসার ত্যাগ করেই যেতে হবে, তবে তার আগে আর একটা কায ক'রে দেখলে হয়। দিনকতক কোথাও গিয়ে লুকিয়ে থাকলেই হয়। তা' হলেই বিবিজান্ বুঝবে এখন, কত ধানে কত চাল? নাঃ— তাই করতে হবে। একটু জব্দ হওয়ার দরকার।

প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়াই রেবতী চলিল—ভবানীপুরের দিকে লুকাইয়া থাকিবার জন্য বাসা খুঁজিতে। বাসা অনেক মিলিল, কিন্তু সুবিধামত মিলিল না। হয়—ভাড়া বেশী, নয় ত—এক বাড়ীতে ৫।৭ জনের সঙ্গে থাকিতে হইবে। অবশ্য আলাদা একটা বাড়ী লওয়া চলিবে না। তার ভাড়াও বেশী, দরকারও নাই। কাহারও বাড়ীর মধ্যে একখানা ঘর হইলেই তাহার চলিবে। দু'একটা মাস কোন প্রকারে সে অজ্ঞাতবাসে কাটাইবে। আর দুই বেলা হোটেল হইতে খাইয়া আসিবে। কিন্তু বহুলোকের সঙ্গে এক বাড়ীতে কাটান— সে মহা অসুবিধা। সুতরাং সে একটা চায়ের দোকানে প্রবেশ করিয়া

সেখানে পবিত্রভাবে মাটীর ভাঁড়ে এক কাপ চা খাইয়া লইয়া আবার ঘরের খোঁজে বাহির হইল।

রমেশ মিত্র রোড, হরিশ চ্যাটারজী ষ্ট্রীট, বকুলবাগান বাই লেন, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, নন্দন লেন, বলরাম বসু ঘাট রোড, রোল্যান্ড ষ্ট্রীট প্রভৃতি খুঁজিয়া তাহার পছন্দমত অনেকগুলি বাটীতে খালি ঘর পাইল বটে, কিন্তু একটি মুস্কিল হইল যে, শুধু বেটাছেলেকে থাকিবার জন্য কেহই ঘর দিতে রাজী হয় না। এক যায়গায় রেবতী বলিল, একলা আমাকে ঘরভাড়া দেবেন না?

না।

না-দেবার হেতুটা কি?

হেতু আছে বই কি।

শুনতে পাই না?

অর্থাৎ আপনি এক জন অজানা ব্যক্তি Third person, তাতে একলা, অর্থাৎ কি না singular number, জানেন ত, third person singular হোলেই verbএর গায়ে s যোগ হয়। তার মানে বুঝতে পেরেছেন ত? অর্থাৎ Third person একলা হোলেই—বিপদ! উঁর হরেক রকমের ক্রিয়াকাণ্ড ঘটবে। Third person, plural হলে আর কোন হাঙ্গামা নেই, তাঁদের ক্রিয়া singular যেমন He বা She—goes, কিন্তু They—go সুতরাং, বুঝলেন না? একলা He-কে বা She-কে সহজে কেউ ঘরভাড়া দেবে না; They হতে হবে।

বাঃ! চমৎকার! আপনি দেখছি একজন মহাপণ্ডিত লোক:

চড়কডাঙ্গা হাইস্কুলে 5th classটি 'লিজ' নিয়ে ফেলেছিলুম। ইচ্ছে

করলে তুড়ি দিয়ে, ঐ গিয়ে পি, আর, এস পর্য্যন্ত হোতে পারতুম। কিন্তু ও-সব বাজে সখ আমাদের ছিল না।

চমৎকার! আপনি দেখছি, একজন মহাশয় লোক আপনার সঙ্গে দুটো কথা কোয়ে আজ ধন্য হোলুম।

তার পর ঘুরিতে ঘুরিতে আরও কয়েকটি ঘর রেবতী পছন্দমত পাইল, কিন্তু সর্ব্বত্রে ঐ এক সুর ;—একলা পুরুষ মানুষকে ভাড়া দেওয়া হইবে না। মনে মনে রেবতী সকলের উপর বিষম চটিয়া গেল। সকলের ত আর স্ত্রী থাকে না, তাহা হইলে তাহারা আর ঘর পাইবে না? খৃষ্টানদের স্বর্গীয় পিতা সেই যে ইভটিকে আদমের সঙ্গে গেঁথে পাঠিয়েছিলেন, এখনও পর্য্যন্ত তার আর ব্যতিক্রম ঘটাবার জো নেই। সম্প্রতি থিয়েটারে সে কি-একখানা বইয়ের অভিনয় দেখিয়াছিল ; যাতে এক যুবকের অনেকটা এই ধরণের বিপদের ব্যাপারই ছি... সেই কথা ভাবিতে ভাবিতে শেষ যে বাড়ীটায় রেবতী গেল, সেখানে কহিল, দেখুন, ঘর আমার পছন্দ হয়েছে ; কিন্তু আমি সস্ত্রীক নই, অ-স্ত্রীক। আমাকে ভাড়া দিতে কোন আপত্য-টাপত্য হবে না ত?

বাড়ীওয়ালা বলিল, আপনি একলা থাকবেন? মেয়েছেলে কেউ নেই?

একটি মেয়ে আছে। সেই মেয়ে—সেই ছেলে। অর্থাৎ বিধবা হয়ে এখন ছেলের মতই পিত্রালয়ে বাস। বুঝলেন না?

বুঝিছি। তা আপনার কন্যাকে নিয়ে যখন থাকবেন, তখন আর—আপত্য কিছু নেই ত?

আজ্ঞে না।

রেবতী নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। কিন্তু বাঁচার আরও একটু দেরী

আছে। একটি কন্যা ত যোগাড় করিতে হইবে। তবে অ-স্ত্রীকের ঘর পাওয়ার মত নি-কন্যার কন্যা পাওয়া, তত শক্ত হইবে না।

বেলা হইয়া পড়িয়াছিল। ঘুরিতেও হইয়াছে অনেক। সুতরাং স্নানটাকে সে-দিন মুলতুবী রাখিয়া রেবতী একটা 'কেবলমাত্র ভদ্রলোকের জন্য' ছাপ মারা হিন্দু হোটেলে প্রবেশ করিল। সেখানে আহারাদি সারিয়া পাণ চিবাইতে চিবাইতে দেখিল, একটি বছর ২৫।২৬ বৎসরের বিধবা যুবতী হোটেলের ঠাকুর-মশায়ের কাছে চুপটি করিয়া বসিয়া আছে। ঠাকুর-মশাইকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে, মেয়েটি ব্রাহ্মণের মেয়ে, তিন কুলে আর কেউ নেই, এক যায়গায় রান্নার কায করিত; সেই কাযটি সম্প্রতি গিয়াছে, তাই ঠাকুর-মশাইকে আসিয়া সুপারিস ধরিয়াছে, কোথাও যদি একটু কায-কর্ম্ম···ইত্যাদি ইত্যাদি।

রেবতী দেখিল, ভগবানের দয়া তাহার প্রতি অসীম। সে মেয়েটিকে বলিল, দেখ মা-লক্ষ্মি, রান্নার জন্যে আমার একটি লোক দরকার। আমি এই একলা লোক। দু'বেলা দুটি রেঁধে খাওয়াতে পারবে, মা? কিন্তু ব'লে রাখি, মা-লক্ষ্মি, আমার বাসাতেই চব্বিশ ঘণ্টা তোমায় তা হোলে থাকতে হবে। রাজী আছ?

ঠাকুরমশাই কহিল, সে ত ওর পক্ষে ভালই হবে। ঘরভাড়াটা বেঁচে যাবে; দিব্যি মেয়ের মত থাকবে।

হাঁ বাবা; ঠিক ঐ নিজের মেয়ের মতই ভেবে থাকতে হবে। কারণটাও আমি তা হোলে খুলে বলি। —বলিয়া রেবতী ঘর ভাড়ার সম্বন্ধে আনুপূর্ব্বিক ব্যাপারটা খুলিয়া বলিল। সমস্ত শুনিয়া মেয়েটি রাজী হইল। কহিল, হাঁ বাবা, সে আমি বেশ থাকব।

ঠাকুর মশাই কহিল, তোমার বরাত ভাল; বেশ থাকবে তুমি যাও, এখনি বাবুর সঙ্গে তাঁহোলে চ'লে যাও।

তাহাই হইল। তখনি দু'জনে সেই বাড়ীতে আসিল। রেবতী বাড়ীওয়ালাকে ডাকিয়া কহিল, আজ থেকেই তা হোলে আপনার ঘর ভাড়া নিলুম। আমার মেয়ে হরিদাসীকে নিয়ে এলুম। ঘর আর দালানটা ও ঝাঁট্-টাট্ দিয়ে পরিষ্কার করুক, আমি জিনিষপত্রগুলো নিয়ে আসি।

রেবতী ঠিক করিয়াছিল, বেশী কিছু জিনিষপত্র আনিবার কোন আবশ্যক নাই। বড় জোর দুইটা কি তিনটা মাস অজ্ঞাতবাসে থাকিয়া নবদুর্গাকে একটু জব্দ করা মাত্র। সুতরাং তাহার চেতলার বাসা হইতে খালি লইয়া আসিল—একখানি ছোট তক্তাপোষ, সেই উপযোগী বিছানা, দু'চারিটা থালা বাসন, নিজের ব্যবহারের জামা কাপড়, দুই চারিখানা বই আর একটা ট্রাঙ্ক। ট্রাঙ্কের মধ্যে খরচের মত কিছু টাকা আর নীল কাগজের মোড়ক—সেই অমূল্য বস্তুটি।

রেবতী তাহার মা-লক্ষ্মীকে লইয়া নূতন বাসায় দিব্য দিন কাটাইতে লাগিল। মেয়ে রান্না-বান্না করে, বাপে-ঝিয়ে খায়! মেয়ে শোয় দালানে, বাপ শোয় ঘরের মধ্যে। বাপ মেয়েকে ডেকে বলে, হ্যাঁ গা মা, কি আজ রাঁধবে বল দেখি? মেয়ে বলে, জগুবাবুর বাজারে কপি কড়াইশুঁটি না কি উঠেছে বাবা, নিয়ে এস; বড্ড খেতে ইচ্ছে করছে। রেবতী কন্যার জন্য তাহাই আনে।

বাড়ীওয়ালার গৃহিণী দুপুরবেলা মেয়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়। জিজ্ঞাসা করে, আর ভাই-বোন কেউ নেই?

একটি ভাই ছিল, ছোটবেলাতেই মারা গিয়েছে।

মা ?

মা মারা গিয়েছে, এই বছর কতক হোলো।

তুমি বিধবা হয়ে থেকে পর্য্যন্তই বুঝি বাপের কাছে ?

হ্যাঁ ; নইলে বাবাকে আর কে দুটি রেঁধে দেবে বলুন।

এইভাবে চলে। দিন ১৪।১৫ পরে এক দিন সকালে বাড়ীওয়ালা-গৃহিণী তাহাকে বলিল, আজ আমরা সব দক্ষিণেশ্বর বেড়াতে যাব ; যাবে তুমি ?

হরিদাসী কহিল, কি ক'রে যাব বলুন ? বাবা আজ দুপুরবেলা থাকবেন না, কোথায় যাবেন। ঘর ফেলে কোথাও যেতে বাবা বারণ করেছেন।

দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর রেবতী কোথাও বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া হরিদাসীকে কহিল, ওরা সব দক্ষিণেশ্বর গেল, তুমিও মা-লক্ষ্মী গেলে পারতে ?

আমি অনেকবার গিয়েছি। ঘরে তালা দিয়ে দিলেন, বাবা ? চাবিটা একবার দিন ত, আপনার গামছাটা বার ক'রে রাখি। বড্ড ময়লা হয়েছে, আজ কেচে দেবো। বলিয়া হরিদাসী রেবতীর হাত হইতে চাবি লইয়া ঘর খুলিল এবং গামছাখানি লইয়া পুনরায় তালা লাগাইয়া দিয়া রেবতীর হাতে চাবি দিয়া দিল।

অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় রেবতী বাসায় ফিরিয়া আসিল। কিন্তু আসিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার চক্ষু স্থির! ঘরের তালা খোলা, ঘর হাঁ-হাঁ করিতেছে! তাহার মা-লক্ষ্মীটি নাই এবং সেই সঙ্গে বাসন-কোসনগুলির

একখানিও নাই, বিছানার চাদরখানা নাই, মশারিটা নাই, আর সকলের উপর ষ্টীল-ট্রাঙ্কটা নাই—যাহার মধ্যে টাকা-কড়ি ছাড়া, নীল কাগজে মোড়া সেই অমূল্য বস্তুটি ছিল। আর কি আছে বা নাই, তাহা দেখিবার মত মনের অবস্থা বা অবসর তাহার ছিল না। সে তখনি হোটেলের সেই ঠাকুরমশায়ের কাছে ছুটিল।

ঠাকুরমশাই সমস্ত শুনিয়া কহিল, সে ত আমার জানা-শোনা কেউ নয়, বাবু। কোথায় তার বাসা, কি তার নাম, কিছুই জানি না। দিন দু'তিন আমার কাছে কাযের জন্য সে আসা-যাওয়া করেছিল।

রেবতী বাসায় ফিরিয়া আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিল! সে বুঝিতে পারিল যে, হরিদাসী তাহার নিকট হইতে ঘরের চাবি চাহিয়া লইয়া তালা খুলিয়াছিল, কিন্তু তালা আর বন্ধ করে নাই। তালা বন্ধ করিবার ভাণ করিয়া, খুব চতুরতার সহিত তাহা কোন রকমে লাগাইয়া রাখিয়াছিল মাত্র। যাহা হউক—বাসন-কোসনগুলোর জন্যেও কিছু নয়, বিছানার চাদর বা মশারির জন্যেও কিছু নয়, গোটা পঞ্চাশ টাকা ট্রাঙ্কের মধ্যে যাহা ছিল, তার জন্যেও ততটা নয়, কিন্তু—সেই জিনিষটি! সেই নীল কাগজের মোড়ক!

রেবতীর চোখে জল আসিবার উপক্রম হইল।

শ্যামবাজার। নিশিকান্তর বাসা।

'নবদুর্গা বসিয়া রেবতীর কথা ভাবিতেছিল,—আজ আঠার দিন হোল, তবুও দেখছি, রাগ এখনও পড়েনি। নেভবার আগে পিদ্দিম যেমন বেশী করে জ্বলে ওঠে, বোধ হয় এ-ও তাই হবে। গণৎকারটার কথাই বোধ হয় ঠিক; এইবার ঝগড়ার বোধ হয় শেষ। তবে ১০৮এর যায়গায় ১০৯ হোল, এই যা। তা ফাউ বলে একটা জিনিষ আছে ত? ১০৮এর একটা ফাউ হওয়া ত উচিত। এ-ও তাই।

সেই সময় নিশিকান্ত আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহার হাতে সেই নীল কাগজের মোড়কটি। নবদুর্গা জিজ্ঞাসা করিল. কি ওটা নিশিকান্ত? নিশিকান্ত কহিল, এটি একটি দুষ্প্রাপ্য জিনিষ। বলিয়া দিদির হাতে মোড়কটি দিয়া, সেইখানে মেজের উপর বসিয়া পড়িল। নবদুর্গা মোড়কটি খুলিতেই দেখিল, উপরে একখানি হাতে লেখা রসিদ রহিয়াছে। বিক্রেতা শ্রীনিবারণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্রেতা শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন ঘোষের নিকট হইতে এক শত এক টাকা নগদ বুঝিয়া লইয়া······ইত্যাদি ইত্যাদি। নবদুর্গা কহিল, হ্যাঁ হ্যাঁ—আমায় বলেছিল বটে যে ১০১৲ টাকা দিয়ে এক মহামূল্য জিনিষ কিনিছি। তা, এ কি ব্যাপার বল্ দেখি?

নিশিকান্ত বলিল, ব্যাপারটা—ভাল করে একটু ভেবে না দেখলে ঠিক বুঝে উঠতে পাচ্ছি না, দিদি। এখন এটা পেলুম—রাজারামের ঘরে।

রাজারামটা কে রে?

রাজারাম হচ্ছে—সুরেশের ঐ টীনের বাড়ীর ভাড়াটে; একখানা ঘর নিয়ে থাকতো। ওর ভাড়া আদায়ের ভার ত আমারই ওপরে কি না। ব্যাটার কাছে আট মাসের ভাড়া ২৮ টাকা বাকী। রোজই বলে—আজ দোবো, কা'ল দোবো। সেদিন বল্লে দেশ থেকে আমার ছোট ভগিনী এসেছে; ভবানীপুরে কোথায় রান্নার কায পেয়েছে। এইবার সব আপনার চুকিয়ে দিয়ে দেবো।—আজ গিয়ে দেখি, বেটা জিনিষপত্র সব নিয়ে পালিয়েছে। কোন ফাঁকে যে সরেছে, অন্য ভাড়াটে কেউ জানতেও পারেনি। ঘরে একটা পাঁচ পয়সার তালা লাগান ছিল। এখন গিয়ে সেটা ভেঙ্গে ফেল্লুম।

সেই ঘরেই বুঝি এটা পেলি?

হ্যাঁ, ঘরের একধারে পড়েছিল—এই নীল কাগজখানায় এলোমেলো-ভাবে জড়ানো; আমি গুছিয়ে-গাছিয়ে, এই রকম প্যাক করে নিয়ে এলুম।

লোকটা কি জাত?

বোল্‌তো ত ব্রাহ্মণ। গলায় পৈতেও একগাছা ছিল, কিন্তু আমার ত বিশ্বাস হয় না।

ভ্রাতা-ভগিনীতে তখন এই নীল-কাগজের মোড়ক লইয়া কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

* * * *

চেতলা হইতে রেবতীর পত্র পাইয়াই আজ সকালে নবদুর্গা শ্যামবাজার হইতে চলিয়া আসিয়াছে। রেবতী লিখিয়াছিল, তাহার অসুখ।

স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া নবদুর্গা কহিল, তা'হোলে অসুখ-টসুখ

সবই মিছে। তা মিছে কথা বলে আমায় আনলে কেন? আবার হুদিন বাদে ত ঝগড়া বাধিয়ে বিদেয় করে দেবে?

রেবতী কহিল, না হুর্গা, আর ঝগড়া করব না। আর অসুখ বলে যে লিখেছি, তা সত্যিই লিখেছি। শরীরে কোন অসুখ নেই বটে, কিন্তু মনের মধ্যে আমার ভয়ানক অসুখ: এক ত তুমি নেই—সে একটা মহা অসুখ, তার ওপর—

আমি নেই, সেটা ত মহাসুখ! ও বাজে কথা রেখে দাও। তার ওপর কি—সেইটে বল।

তার ওপর, ১০১ টাকা দিয়ে যে অমূল্য দ্রব্যটি পেয়েছিলুম, সেইটি আমার চুরি গেছে। লাভ করেও, কি জিনিষ যে হারালুম, হুর্গা, তা আমিই জানি।

জিনিষটা কি বল দেখি?

জিনিষটা? সে আর কি বোলবো!—রেবতীর অন্তর ভেদ করিয়া একটি হুঃখের নিঃশ্বাস বাহির হইল। তার পর স-বিষাদে কহিল, শ্রীগৌরাঙ্গ যে কাঁথাখানি গায়ে দিতেন,—সেই কাঁথা। অমূল্য জিনিষ হুষ্প্রাপ্য বস্তু।

তা, অত যে ঝগড়াটে, তার কাছে কখনো তেমন জিনিষ থাকে

স-খেদে রেবতী কহিল, ঠিকই বোলেছ তুমি। মহা-পাপীর কাছে সে পুণ্যময় জিনিষ থাকবে কেন? আর আমি তোমার সঙ্গে ঝগড় করব না।

তুমি যদি গৌরাঙ্গদেবের নাম নিয়ে দিব্যি করে বল যে, আর কখনো আমার সঙ্গে অন্যায় ঝগড়া করবে না, তা হোলে সেই

কাঁথা আমি তোমায় এখনি দিতে পারি। সে কাঁথা আমার হাতে এসেছে।

লাফাইয়া উঠিয়া রেবতী কহিল, শ্রীগৌরাঙ্গের সেই কাঁথা?

হ্যাঁ।—বলিয়া নিজের তোরঙ্গ হইতে সেই নীল-কাগজের মোড়কটি বাহির করিয়া বলিল, এই ত?

মহা-উল্লাসে নবদুর্গার হাত হইতে মোড়কটি ছিনাইয়া লইয়া রেবতী বলিয়া উঠিল, এই—এই—এই—দুর্গা! এই সেই জিনিষ!

তা, চুরি হোয়েছিল কি ক'রে?

কি করে?—ভয়ানক গরম; রাত্রে দরজা খুলে শুয়েছিলুম। হঠাৎ দেখি, একটা হিন্দুস্থানী গোছের লোক, ঝাঁকড়া চুল,——সে সব ধীরে সুস্থে তোমায় বলব এখন। তা, তুমি কোথা থেকে পেলে, দুর্গা?

আমি প্রথমে পেয়েছিলুম সেবার ঠাকুমার কাছ থেকে। তোরঙ্গে আমসত্বের দাগ লাগবে বলে তলায় পেতে দিয়েছিলেন। আমি দিয়ে আসি—নিশিকান্তকে। নিশির একটা নতুন মক্কেল ওর সূক্ষ্ম সূচের কাষ দেখে অনেক করে ওটা চেয়ে নিয়ে যায়! সেই লোকটাই সম্ভবতঃ ঐ জাল নিবারণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যে তোমার কাছ থেকে ঠকিয়ে একশো একটি টাকা নিয়ে গিয়েছে। দুঃখের বিষয়—লোকটা একটা ছুটো মক্কেল; নিশির সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হবার কোন সম্ভাবনা নেই। তা থাকলে, হয় ত টাকাটা তোমার আদায় হোয়ে যেত।

রেবতী হাঁ করিয়া নবদুর্গার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল!

নবদুর্গা কহিল, তারপর তোমার কাছ থেকে কি করে চুরি হয়, তা জানি না। অবশেষে গিয়ে পড়ে ওটা——রাজারাম রক্ষিৎ তার

বোনের হাতে। সেখান থেকে পায় নিশি। নিশির কাছ থেকে পাই আমি। তা এখন দিব্যি কর আর ঝগড়া-টগড়া করবে না?

রেবতী অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া কহিল, গৌরাঙ্গের নাম নিয়ে দিব্যি করে বলছি দুর্গা, আর তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব না। তোমার সঙ্গে ঝগড়া করে থাকা কি আমার চলে; তুমি হোলে আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী—আমার সাত রাজার——বলিতে বলিতে রেবতী নবদুর্গার কাঁধ ধরিয়া, মুখখানা তাহার মুখের কাছে লইয়া গেল। নবদুর্গা তাহাকে ঈষৎ ঠেলিয়া দিয়া কহিল, অত ভালবাসায় আর দরকার নেই। তা হোলে হয় ত আবার ঝগড়া বাঁধিয়ে ফেলবে। তা, ঝগড়াতে আমার সঙ্গে তুমি যতটা মজবুত, বুদ্ধি-সুদ্ধিতে ত তেমন মজবুত নও?

কেন?

নইলে, শ্রীগৌরাঙ্গের কাঁথা বলে ঠকিয়ে একশ একটা টাকা নিয়ে গেল। এটা তোমার মাথায় এলো না যে, সে জিনিস কি যার-তার কাছে আছে, না, ১০১ টাকায় তা পাওয়া যায়? মহাপ্রভুর গায়ের কাঁথা যে অমূল্য সম্পত্তি! হাজার টাকাতেও যে সে জিনিষ পাওয়া যায় না! তার দাম কি টাকায় হয়?

রেবতী বোকার মত নবদুর্গার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। হাতে তাহার সেই—কাগজের মোড়ক।

শ্যাম দাদা

(১)

তাঁহার চেহারাটা হৃষ্ট-পুষ্টও ছিল না, শীর্ণ ও ছিল না—মাঝামাঝি। তিনি ঢেঙ্গাও ছিলেন না, খাটও ছিলেন না—মাপ-সই। গায়ের রং ফর্সাও নয়, কালও নয়—অর্থাৎ যাকে বলে উজ্জ্বল-শ্যাম বর্ণ—তাই। মাথার সব চুলেই পাক ধরে নাই, অথচ সবই যে কাঁচা তা'ও নয়—কাঁচায়-পাকায় মিশ্রিত। পিতার তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রও নহেন, কনিষ্ঠও নহেন—তিনিই মধ্যম। নাম তাঁহার—শ্যামাচরণ।

দেশের অধিকাংশেরই এবং তাঁহার কলিকাতার আফিসের সকলেরই তিনি শ্যামদাদা হ'ন। পূরা নাম তাঁহার—শ্যামাচরণ রায়। জাতিতে বৈদ্য।

কাটোয়া হইতে ক্রোশ দেড়েক পশ্চিমে রতনপুরে তাঁহার বাড়ী। দেশে বৃদ্ধ পিতা, স্ত্রী, ছোট ভাই গৌর, নিজের দু' একটী শিশু পুত্র-কন্যা এবং মৃত বড় ভাইদের একমাত্র পুত্র শচীন্দ্রকুমার – এই কয়জন থাকেন। তিনি নিজে কলিকাতায় চাকরী করেন এবং বৌবাজারের এক মেসে থাকেন। শচীন্দ্র কাটোয়ায় এক হোষ্টেলে থাকিয়া পড়াশুনা করে।

প্রতি শনিবার হাওড়া হইতে সওয়া তিনটার কাটোয়া-লোক্যালে চাপিয়া শ্যাম দা' সন্ধ্যার পূর্ব্বে কাটোয়ার ষ্টেসনে নামেন এবং সেখান হইতে শচীকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী আসেন। আবার সোমবার উভয়ে ফেরেন—শচী কাটোয়ায় এবং শ্যাম দা' কলিকাতায়। আজ পনর বৎসর ধরিয়া এইরূপেই শ্যামদা'র জীবনের দিনগুলি কাটিয়া আসিতেছে। তাঁহার কর্ম্মজীবনের এই এক ঘেয়ে গতির আর বিরাম নাই, বৈচিত্র্য নাই, পরিবর্ত্তন নাই।

কিন্তু সম্প্রতি একটুখানি বিচিত্রতা আসিয়াছে। কনিষ্ঠ ভ্রাতা গৌরকিঙ্করের বিবাহ।

বিবাহ হইতেছে শ্যামবাজারে। শ্যামদাদার মামাতো ভাইয়েরা থাকেন—ভবানীপুরে। তাঁহাদের দ্বারাই এই বিবাহের যোগাযোগ-ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। বিবাহের কথাবার্ত্তা সবই পাকাপাকি হইয়া গিয়াছে। আজ কন্যার পিতা ছেলেকে পাকা দেখিতে যাইবেন। ব্যবস্থা হইয়াছে, কাটোয়া লোক্যাল ধরিবার জন্ম তাঁহারা পূর্ব্ব হইতে হাওড়ার ষ্টেসনে আসিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকিবেন—শ্যাম দা' সাহেবের কাছ হইতে একটু সকালসকাল ছুটি লইয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইবেন এবং তাঁহাদের লইয়া দেশে যাইবেন। তথায় রাত্রে থাকিয়া পরদিন প্রাতে তাঁহারা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবেন।

বেলা বারটার সময় টার্ণবুল কোম্পানীর ক্লিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের একখানা চেয়ারে বসিয়া শ্যাম দা' এই বিবাহের কথাই ভাবিতেছিলেন —'কি করা যায়? আজকের পাকা দেখার কাজটা চুকে গেলেই একটা বড় দায় মিটে যায়। বিয়ের দিনের ভাবনা বড় একটা নেই, ভবানীপুর থেকেই বরানুগমন হবে। সে দিনের সে-সবের ভার সোমেশ

আর শরতের ওপর। ওদিনের ঝক্কিটা ওরা দু' ভাই পোহাবে এখন। তারপর দেশের বাড়ীতে বৌ-ভাতের আয়োজন। সেইটেই গুরুতর ব্যাপার।'—তাঁহার হাতে কলম, সামনে টেবিলের উপর একখানি হিসাবের কাগজ এবং কাণে একটী পেনসিল। টাকা-আনা-পাইয়ের একটা হিসাব তিনি ঠিক দিতে বসিয়াছিলেন! ঠিক দিলে উহা ৪১২৯।৵৮ পাই হইবার কথা। কিন্তু শ্যাম দা' আজ তিনবার উহা ঠিক দিয়াছেন, কোন বারই মিলিতেছে না; একবার হইয়াছে—১০৩২৯।।৵৮ পাই, তাহার পরের বার হয় ৩২২৯৷৵৮ পাই এবং শেষবার হইয়াছে ৪২২৮।৵৮ পাই। অগত্যা তিনি কাণে পেনসিল গুঁজিয়া কাগজখানি টেবিলের উপর ফেলিয়া রাখিয়া, আজিকার পাকা-দেখার ব্যবস্থা ও আয়োজনের কথা বসিয়া বসিয়া একান্ত মনে চিন্তা করিতেছিলেন।—'বেলা ত একটা বাজে। আফিস থেকে অন্ততঃ দুটো কি আড়াইটার সময় বেরুতেই হবে। ছুটী পেলে হয়, ছুটী যেমন করে হোক পেতেই হবে। বে-আদব হিসেবটাও ত কিছুতেই মেলাতে পারলুম না। আজ ও আর মিলবেও না। চুলোয় যাক ঘোড়ার ডিমের হিসেব।"

ঠুং। সাড়ে বারটা বাজিল।

একটী বাবু ব্যস্ত হইয়া শ্যাম দা'র পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। শ্যাম দা' তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া কহিলেন—"কি? নিতে এসেছ? মেলাতে পাচ্ছি না ভাই। শরীরটা আজ, জান বিধু বাবু, যেন কেমন-কেমন কচ্ছে। মাথাটা ঘুরছে, বুকটা থেকে-থেকে ধড়-ফড় করে উঠছে। সাহেব কি এখনি চাইছে নাকি?"

—চো-চো—

"হ্যাঁ। সাহেব বলছে, ওটা হয়ে গেলে 'ইনভয়েস্' গুলো আজই সেরে ফেলতে হবে "

শ্যাম দা' প্রমাদ গণিলেন। মনে মনে বলিলেন, "সেরে ফেলছি এই। একটা ত বাজে। ছুটী ত দেবেই না বোঝা যাচ্ছে,—সুতরাং।"
গোঁ—ওঁ—ওঁ—ওঁ—ওঁ। শ্যাম দা' নিমীলিত চক্ষে অজ্ঞান হইয়া চেয়ারে ঢলিয়া পড়িলেন। দেখিতে দেখিতে 'গোঁ-গোঁ'-র ভয়ানক বৃদ্ধি এবং পরক্ষণেই—ধপাস! চেয়ারশুদ্ধ শ্যাম দা' মেজের উপর ঠিকরাইয়া পড়িলেন।

তখনি ডিপার্টমেন্টের সকলে ছুটিয়া আসিল। হুলস্থুল ব্যাপার! শ্যাম দা'কে ঘিরিয়া চারিদিকে ভীড় জমিয়া গেল। কেহ বলিল—'ফিট', কেহ বলিল—ঘুর্ণি, কেহ বলিল 'উইক্‌নেস্'। যথাসম্ভব সকলে মিলিয়া সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। বালতি ভরা জল আসিয়া পড়িল, দারোয়ানের লোটা আসিল, পাখা আসিল। তারপর প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে যখন শ্যাম দা'র জ্ঞানের সঞ্চার হইল, তখন আসিল—উপরি-উপরি দুই কাপ গরম দুধ আর সাহেবের হুকুম—'একখানা ট্যাক্সি ডাকিয়া শ্যাম দা'কে তাঁহার মেসে পৌঁছাইয়া দেওয়া হোক।'

হাওড়ার ষ্টেশনে কন্যা-কর্ত্তারা হাজির ছিলেন। শ্যাম দা'র মামাতো ভাই শরৎ তাঁহাদের সহিত আসিয়াছিল। শ্যাম দা' তাহাকে চুপি চুপি অনেক কিছু বলিয়া শেষকালে কহিলেন—"ঐ বুদ্ধিটুকু না খাটালে আজ সকালসকাল ছুটিও পেতুম না, আসতেও পারতুম না। বাঁ দিকে কাণের নীচেটায় একটু কেটে গেছে।" বলিয়া কাণের নীচে সেই স্থানটীতে [illegible] একবার হাত দিলেন।

[illegible] অবাক হইয়া শ্যাম দা'র মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

(২)

ভবানীপুরে শরৎদের গৃহে অপরাহ্ণ বেলায় বৈঠক বসিয়াছিল।

আজ রবিবার। বুধবার গৌরের বিবাহ। সেদিন এইখান হইতেই বর ও বরযাত্রীরা যাইবে। মধ্যে আর দুইটী দিন মাত্র বাকী। আজ প্রাতে শ্যাম দা'র এখানে আসিবার কথা ছিল। অনেক কিছু ব্যবস্থা-বন্দোবস্তের দরকার। কিন্তু শ্যাম দা'র আজ সমস্ত দিনের মধ্যে দেখা নাই। শরৎ, তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সোমেশ, বাড়ীর মেয়েরা সকলেই সমস্ত দিন ধরিয়া শ্যাম দা'র এ বাড়ীতে আসিবার অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু শ্যাম দা' আসেন নাই। দুপুর বেলা বৌবাজারে তাঁহার মেসে লোক পাঠান হইয়াছিল, সে লোক শ্যাম দা'কে খুঁজিয়া পায় নাই। মেসের লোকজন কেহ কোন সংবাদ বলিতে পারে নাই। মেসের একটী ভদ্রলোককে শ্যাম দা' বেয়াই বলিয়া ডাকিতেন। সেই ভদ্রলোকটী শুধু বলিয়াছেন—'বেয়াই, হঠাৎ লোটা-চিমটে নিয়ে, গেরুয়া পরে বিবাগী হয়ে গেছে।' যে লোকটী শ্যাম দা'র খোঁজে গিয়াছিল, সে একেবারে [illegible] এবং অত্যন্ত সরল প্রকৃতির লোক। বেয়াইয়ের এই তামাসাটাকে না বুঝিয়া, কথাটাকে ধ্রুব সত্য বলিয়াই বুঝিয়াছিল এবং এ বাটীতে ফিরিয়া সেইরূপই বলিয়াছিল। তাহা [illegible] সকলের মধ্যে তখন একটা হাসির রোল পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু যাই

হোক্—'শ্যাম দা' আজ এলেন না কেন এবং গেলেনই বা কোথায়? কাজের যে আর অন্ত নাই। শ্যাম দা' না এলে যে কিছুই হবে না!'

শরতের স্ত্রী সোমেশের স্ত্রীর কাণে চুপি চুপি কহিল—"যদু যা বলছে দিদি, হয় ত বা সত্যিই তাই হবে। ভাসুর ঠাকুরের ত চিরকালই ঐ রকম ভাব, সাধু-সন্ন্যাসী দেখলে একেবারে—"

বাধা দিয়া বড়বধূ কহিলেন—"তুই কি ক্ষেপেছিস ছোটবৌ?"

শরৎ তাহার দাদার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—"আমি না হয় আর একবার তাঁর মেসে গিয়ে খোঁজ করে আসি।"

তাহার বৌদিদি বলিলেন—"ঠাকুরপোর কথা শোন একবার। যদু গিয়ে দেখে-শুনে এল, আবার তুমি গিয়ে সেখানে নতুন করে কি সন্ধান আনবে? তার 'মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল'। মেসে থাকলে সে সকাল-বেলাতেই ছুটে আসতো।"

শরতের স্ত্রী তাহার বড় জায়ের কাণে কাণে কহিল—"একবার শ্যামবাজারে মেয়েদের বাড়ী খবর নিলে হয় না, ওখানে এসেছিলেন কিনা, কিম্বা ওঁদের কোন খবর-টবর পাঠিয়েছেন কিনা।"

সোমেশ কহিলেন—"রাল সাহেবের কাছ থেকে তাঁর ছুটী নেবার কথা ছিল। এক হপ্তার ছুটী নিয়েছেন নিশ্চয়। হয় ত ছুটী পেয়ে বৌ করে একবার বাড়ী চলে গেছেন। কিন্তু তা গেলেও আজ তাঁর এখানে ফিরে আসা উচিত ছিল।"

যদু এতক্ষণ একধারে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। সে কহিল, "মেসের ভদ্দরলোকটি কিন্তু তামসা-টামসা করে বললেন নি-ক। শ্যাম দা' বিবাগী হয়েই হয় ত কোথা চলে গেছেন।"

"তোর মাথা হোয়েছে" বলিয়া বড়বধূ উঠিয়া গিয়া রোয়াকের নীচে নর্দ্দামায় পানের পিক ফেলিয়া আসিয়া বসিলেন।

সেই সময়ে পাশের বাড়ী হইতে নন্দবাবুদের চাকর আসিয়া কহিল—"টেলিফোনে আপনাদের কে ডাকছেন।" নন্দবাবুর বাড়ীর টেলিফোনে ইঁহাদের অনেক সময় অনেক কাজ হইত। শরৎ তাড়াতাড়ি উঠিয়া নন্দবাবুর বাহিরের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

"হ্যাল্লো!"

"হ্যালো। তুমি কে?"

"আমি শরৎ। —শ্যাম দা' নাকি? কি খবর?"

"ফাদার ডেড্!"

শরৎ আঁৎকাইয়া উঠিল। টেলিফোনের রিসিভারটা তাহার হাত হইতে খসিয়া পড়িবার উপক্রম হইল।

"শনিবার সন্ধ্যার ট্রেনে বাড়ী গিয়েছিলুম। এই ফিরছি। সব বাড়ী থেকো, আমি এখনি যাচ্ছি।"

আধঘণ্টা তিন কোয়ার্টারের মধ্যে শ্যাম দা' এ-বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলের বিমর্ষ ভাব আরও বাড়িয়া উঠিল। শরৎ তাহার পিসেমহাশয়কে খুব ভালবাসিত। অশ্রু-ছল-ছল চক্ষে সে জিজ্ঞাসা করিল—"হঠাৎ কি অসুখটা হোল?"

"শোন না। এক হপ্তার ছুটির জন্যে দরখাস্ত লিখে সাহেবকে দেবার জন্যে চ'চ.রবার তার ঘরের দরজার সামনে গেলুম। বাইরে দাঁড়িয়ে কাণ পেতে শুনলুম—সাহেবের মেজাজ একেবারে চড়া পর্দ্দায় [illegible] মেমের সঙ্গে ঝগড়া-ঝগড়া করে এসেছে। বড়বাবুকে পর্য্যন্ত ধমকে [illegible]

একেবারে অস্থির। আমি দেখলুম, গতিক খারাপ ; ছুটি পাবার আশা মোটেই আর নেই। তখন '৫টা-৫৭'তে চলে গেলুম একেবারে কাটোয়া।"

শরতের অন্তঃস্থল হইতে বেদনাভরা একটি দীর্ঘশ্বাস ধীরে ধীরে বাহির হইল।

"একেবারে শ'চের হোটেলে গিয়ে উঠ্‌লুম। তখনি টেলিগ্রামের 'ফরম্' একখানা যোগাড় করে তাকে দিয়ে লেখালুম—'ফাদার এক্সপায়ার্ড, কাম্ ম্যাট্ ওয়ান্স।' কাল সকালেই ছাড়তে বলে দিয়ে এসেছি। কাল ১১টায় অফিসে গিয়েই পাব এখন। এইবার ছুটি কেমন না হয় দেখি।"

সকলের মুখ একসঙ্গে শ্যাম দা'র মুখের দিকে ফিরিল। শরৎ চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"উঃ! তা হলে false?" শরতের নাড়ী যেন আবার ধাতে আসিল।

সোমেশ হতভম্বের মত হইয়া গিয়াছিলেন। এতক্ষণ নির্বাক হইয়া থাকিবার পর এইবার সহসা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বধূদ্বয় মুখে কাপড় চাপা দিয়া হাসিতে হাসিতে এ-ঘর হইতে পালাইয়া গেলেন। যদু লুটো-পুটি খাইতে খাইতে তক্তপোষ হইতে নীচে পড়িয়া গেল। আর শ্যাম দা' সকলকে একটা ধমক দিয়া বলিয়া উঠিলেন—"আঃ, হচ্ছে কি? ব্যাপারটা সব শোন একবার। তারপর—

(৩)

শুভকর্ম্ম গতকল্য সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ গতকল্য বুধবার অষ্টমী তিথি এবং রোহিণী নক্ষত্রের শুভলগ্নে শুভযোগে শ্যাম দা'র কনিষ্ঠ গৌর-কিঙ্করের শুভ বিবাহ হইয়া গিয়াছে। আজ প্রাতে বর-বধূ লইয়া শ্যাম দা' দেশে যাইবেন। কাল সেখানকার হাটের দিন, শ্যাম দা' কাল বৌ-ভাতের হাট-বাজার করিবেন। তাহার পর শনিবার সেখানে বৌ-ভাতের বিপুল আয়োজন।

দশ দিনের ছুটি শ্যাম দা'র মঞ্জুর হইয়া গিয়াছিল। এই মঞ্জুর হওয়ার গোড়ায় দুই একটা ছোট কথা আছে। শনিবার ছুটির দরখাস্তখানা শ্যাম দা' সাহেবকে দিতে গিয়া যখন তাঁহার মিলিটারী মেজাজ দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, তখন যে তিনি অনুমান করিয়াছিলেন যে, নিশ্চয় গৃহে আজ মেম-সাহেবের সহিত ঝগড়া হইয়াছে, হয় ত তাঁহার সেই অনুমান সত্যই এবং এ অনুমানও হয় ত সত্য যে, সেই ঝগড়া পরদিন রবিবার আপোষে মিটিয়া যায় এবং তাহার ফলে সোমবার যখন সাহেব আফিসে আসেন, তখন তাঁহার মুখখানা প্রফুল্ল এবং হাসিভরা এবং মেজাজ তাঁহার অসম্ভব রূপ দিল-দরিয়া। আসিয়াই তিনি শ্যাম দা'কে ডাক দেন এবং শ্যাম দা' আসিলে তিনি বলেন—"শ্যামাচরণ সেডিন টোমার ফীট হোইয়াছিলো—টোমার মাঠা ভারি উইক্ আছে, টুমি ভাল ডক্টর ডেখাইয়া একটা টনিক ওষুড খাও, উহার ডাম হামি টোমাকে ডিয়ে ডেবে!"

শ্যাম দা' তখন ভাবিতেছিলেন—"টেলিগ্রামখানা এখনো আসছে না কেন, এই সময় এলেই ভাল হোতো !'

সাহেব কহিলেন—"টুমি এখন টীরে টীরে আস্‌টে আস্‌টে কাজ করিবে। হামি হোরিশকে বলিয়া ডেবে টোমায় খুব কম কাজ ডিটে।"

হরি! হরি! শ্যাম দা'র টেলিগ্রাফ আসিয়া হাজির!

টেলিগ্রাফ পড়িয়া শ্যাম দা' সাহেবের সম্মুখে মেজের উপর ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িলেন। তবে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন না। কতক জ্ঞান কতক অজ্ঞান, এইরূপ ভাব। হাত হইতে টেলিগ্রাম খানা খসিয়া পড়িল। সাহেব তাহা তুলিয়া লইয়া পাঠ করিলেন :—

Father Expired Come Sharp

Gour.

সাহেব সান্ত্বনার বাক্যে শ্যাম দা'কে কহিলেন—"শ্যামাচরণ টুমি এখনি চোলিয়া যাও, ডশ ডিন' টোমার Special Leave রহিল। চিন্টা করিও না, ভোগোবান টোমার সহায়টা কোরিবেন।"

পিতৃ-মৃত্যু-সংবাদে যৎপরোনাস্তি কাতর ও বিচলিত হইয়া শ্যাম দা' তৎক্ষণাৎ আফিস ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন। এ কয়দিন শ্বশুরদের ওখানেই তাঁহার কাটিয়াছে। এই তিন দিন শ্যাম দা' ঘরের ভিতরই দিনরাত আবদ্ধ হইয়া আছেন। একটীবারও পথে বাহির হন নাই। কি জানি, যদি অফিসের কাহারো সহিত দৈবাৎ দেখা হইয়া যায়। পথ পরের কথা, এই কয়দিন তিনি বৈঠকখানায় পর্য্যন্ত বসেন নাই, যদি অবাঞ্ছিত কেহ আসিয়া পড়ে। শুধু কাল বরাত্রগমনের সময় তাঁহাকে

গৃহাভ্যন্তর ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তবে তখন রাত্রিকাল, আর সদর এবং সোজা রাস্তা রসা রোড় দিয়া বর না লইয়া গিয়া, তিনি একটু ঘুরিয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

তারপর বিয়ের কার্য্য নির্ব্বিবাদেই সুসম্পন্ন হইয়া যায়। কেবল একটু গোল বাধিয়াছিল ছোট ছোট কয়েকটী বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীদের মধ্যে। শরৎ ও সোমেশের পুত্র কয়টী অর্থাৎ রবি, কালো, কেষ্ট, হারাণ ও নন্দ বরযাত্রী হইয়া আসিয়াছিল। কন্যাযাত্রীর একটী ক্ষুদ্র রেজিমেণ্ট আসিয়া তাহাদের কয়জনকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল এবং তাহার পরই তাহাদের প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ :—

"তোমার নাম কি ভাই ?"

"আমার নাম নন্দ।"

"নন্দ ? আমার নাম গন্ধ। কোন্ ক্লাশে পড় স্যাঙ্গাত ?"

"ক্লাশ টু-তে।"

"আচ্ছা বল দেখি, কোন্ জিনিষটা কাট্‌লে বাড়ে।"

নন্দ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। ভয়ানক অপ্রস্তুত হইবার উপক্রম। রবি নন্দকে রক্ষা করিতে একটু এদিকে সরিয়া আসিয়া বসিয়াই কহিল—"কোন্ জিনিসটা কাটলে বাড়ে? তোমার নাক কাণ কেটে দেখ, সঙ্গে সঙ্গেই বেড়ে যাবে। নিজে না পার, ছুরি নিয়ে এস, আমরা কেটে দেখিয়ে দি।"

উত্তর শুনিয়া ও-দলের ছেলেটী একটু মুসড়িয়া গেল। তখন হারাণ তাহার সিল্কের পাঞ্জাবীর বুক-পকেট হইতে ফুলতোলা রুমালখানা লইয়া মুখখানা একবার মুছিয়া লইবার পর ও-দলকে প্রশ্ন করিল—"আচ্ছা,

এইবার তোমরা বল দেখি—"How many elephants can stand upon the needle point ?"

এমন সময় আহারের ডাক আসিল! সে ডাকের বন্যায় ছুঁচও ভাসিয়া গেল, হাতিও ভাসিয়া গেল।

তাহার পর বিশেষ কোন ঘটনা আর ঘটে নাই।

আজ প্রাতে শ্যাম দা' বর-বধূ লইয়া দেশে যাইবেন, সেই একটা মস্ত ঘটনা। শরতকে কহিলেন—"তোমাকে সঙ্গে যেতে হবে। আর বৌমাদের নিয়ে সোমেশ না হয় কাল যাবে'খন।"

শরৎ কহিল—"তাই হবে।"

"আর একটা কথা। এখান থেকে বেরুতে দেখছি ১০টা বেজে যাবে। গাড়ী হচ্ছে বুঝি এগারটায়? আচ্ছা, কোন্ পথ দিয়ে ষ্টেসনে যাবে?"

"বরাবর রসা রোড দিয়ে, তারপর চৌরঙ্গী, ড্যালহাউসী, আপনার আফিসের সামনে—

"ওরে বাবা রে!" লাফাইয়া উঠিয়া শ্যাম দা' বলিলেন—"ওরে বাবা রে! তুমি কি আমাকে দিয়ে মজাতে' চাও নাকি? অফিসের সামনে দিয়ে যাই, আর সব আমাকে দেখতে পাক, শেষকালে সাহেবের কাণে উঠুক! সে হবে না; গাড়ী ঘুরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।"

"বেশ তাই হবে। কোথা দিয়ে যাওয়া হবে, বলুন।"

একটু ভাবিয়া শ্যাম দা' বলিলেন—"আচ্ছা, দার্জ্জিলিং মেল শিয়ালদহ ছাড়ে কখন?"

চোখ কপালে তুলিয়া শরৎ বলিল—"তোমার মাথা কি খারাপ হোল

শ্যাম দা'? যাবে তুমি ব্যাণ্ডেল হোয়ে কাটোয়া, সে জায়গায় তুমি ই, বি, আরের নৈহাটী ঘুরে—"

"আরে, ঘুরি কি সাধে! কেউ দেখে ফেললে যে মহা বিপদ! তুমি বুঝছ না ভায়া। জল-জ্যান্ত ফাদারকে এক্সপায়ার্ড করা হোয়েছে, সুতরাং—"

"সুতরাং যা করবার সে আমি করব, এখন তোমার ও-সব দুশ্চিন্তার দরকার নেই।"

শ্যামদা'র দুশ্চিন্তা অতঃপর বাহিরে ফুটিয়া বাহির না হইলেও ভিতরে তাহা জমিয়া রহিল।

বেলা প্রায় সাড়ে দশটার সময় তাঁহাদের ট্যাক্সিখানা যখন গড়ের মাঠের ভিতর দিয়া, হাইকোর্টের দক্ষিণ পথ ধরিয়া,গঙ্গার ধারে ষ্ট্র্যাণ্ড রোডে আসিয়া পড়িল, তখন শ্যাম দা'র সচকিত ভাব। তাঁহার আফিসের পিছনকার ফটক—ঐ সামনে! শরতের ভয়ে, মুখে আর কিছু প্রকাশ করিতে পারেন না। ক্রমে গাড়ী টার্ণবুল কোম্পানীর আফিসের পিছনকার ফটকের কাছে আসিয়া পড়িল। শ্যাম দা' মনে মনে বলিলেন—'আজ আবার ঘোড়ার ডিম—'মেল ডে'! ঐ রে! যদু মিস্তির দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে! সর্বনাশ! বেটা যে আমার পরম শত্তুর! দেখতে পেলে নাকি?' তিনি তাড়াতাড়ি গায়ের চাদরখানা খুলিয়া তদ্দ্বারা মাথা ও মুখ ঢাকিয়া ফেলিলেন। শরৎ কহিল—"এ কী শ্যাম দা'?" শ্যাম দা' কহিলেন—"চুপ কর ভাই, বিপদ যে কত, তা তুমি বুঝবে না। **Fifteen years**-এর **service**,—বুঝছ না?"

শরৎ আর কিছু না বলিয়া একটু হাসিল, গৌরও মনে মনে বোধ হয় একটু হাসিল। নব-বধূটী হাসিল কি না, তাহার এক-গলা ঘোমটার আড়ালে তাহা আর দেখা গেল না।

ব্যাণ্ডেল ষ্টেসন।

বেলা একটা বাজিয়া গিয়াছে।

কাটোয়ার গাড়ী ১টা ৩৯এ ছাড়িবে। শ্যাম দা' বলিলেন—"শরৎ।"

"কি বলছ?"

"না—থাক্।"

"থাকবে কেন—বল না।"

"বলছি কি, বাড়ী গিয়ে পৌছতে পারলে বাঁচা যায়।"

"হ্যাঁ।"

—"বলি, অ শ্যাম দা'! শ্যাম দা!" ও দিক্‌কার প্লাট্‌ফরমে কতকগুলি ভদ্রলোক বসিয়া ছিলেন, তাঁহাদেরই মধ্য হইতে কেহ উচ্চৈঃস্বরে শ্যাম দা'কে ডাকিতে লাগিলেন।

"শ্যাম দা' শুনতে পাচ্ছ না? অ শ্যাম দা'?"

শ্যাম দা' নীরব নিস্পন্দ, নির্ব্বিকার! মুখখানাকে অসম্ভবরূপ বিকৃত করিয়া পিছন ফিরিয়া বসিয়া রহিলেন। শরৎ কহিল,—"সাড়া দাও না শ্যাম দা'।" শ্যাম দা' ঝাঁকি দিয়া কহিলেন—"তুমি চুপ কর, শরৎ। লক্ষ্মীছাড়াটা কে বল দেখি? তুমি ওদিকে আর চেও না।"

পুনরায় চীৎকার—"বাড়ী যাওয়া হচ্ছে না কি, অ শ্যামদা'? বিয়ে কা'র হোলো?"

শরৎ কহিল—"সাড়া দাও, শ্যাম দা'; তোমার কোন ভয় নেই।"

"কে শ্যাম দা'! শ্যাম দা'-ফ্যাম্ দা'. এখানে কেউ নেই বাবা! উঃ! এখানে পর্য্যন্ত—! নাঃ,—Father expired নিয়ে একটা বিপদ না ঘটে আর যাবে না দেখছি। ঘোড়ার ডিমের চাকরী এবার না হয় ছেড়েই দেবো। ৩০ বিঘে জমী ত আছে ভাগে দেওয়া। চাষ-বাসই লাগিয়ে দোবো। এতেও ত ডাল-ভাতের বেশী কিছু হয় না, তা'তেও ডাল-ভাত দুটো হোয়ে যাবে'খন। বরং এই ভয়ভয়, উদ্বেগ আর গোলামীর হাত থেকে বাঁচা যাবে।"

ও-প্ল্যাটফরমের ভদ্রলোকটীর কিন্তু অসীম ধৈর্য্য। এবার দাঁড়াইয়া উঠিয়া চীৎকার সুরু করিল—"শ্যাম দা' কি কালা হোলে, না, চিনতে পাচ্ছ না?"

শ্যাম দা' এবার মরিয়া হইয়া উঠিলেন। একেবারে সোজা দাঁড়াইয়া উঠিয়া, ভদ্রলোকটীর দিকে ফিরিয়া উচ্চ কণ্ঠে কহিলেন—"এই, ছোট ভাইয়ের বে দিয়ে বর-কনে নিয়ে দেশে যাচ্ছি। Father expired বলে দিন দশেকের ছুটী নিয়েছি। আর শীগ্‌গীরই চাকরীর মাথায় তিনটে লাথি মেরে, চাষ-বাসের ব্যবস্থাটাই করব। তুমি ভাল আছ ত? যাওয়া হ'চ্ছে কোথায়?"

লোকটী সব কথাগুলোর মানে বুঝিতে পারিল না। কহিল—"ত্রিবেণীতে একটা তাগাদা ছিল, তাই এসেছিলুম, বৈঁচি ফিরে যাচ্ছি। রতনপুরের খবর সব ভাল ত?"

মনে মনে অতি মাত্রায় বিরক্ত হইয়া, মুখখানাকে তোলা হাঁড়ি করিয়া, ব্যঙ্গ করিবার মত স্বরে শ্যাম দা' কহিলেন—"খবর খুব ভাল—চমৎকার! আর কিছু বলবার-টলবার আছে?" গজ্ গজ্ করিয়া শ্যামদা' অতঃপর কি বলিতে লাগিলেন, তাহা বুঝা গেল না।

শরৎ কহিল—"শ্যাম দা', তোমার মাথা ঠিকই খারাপ হয়েছে।"

"ভাই, বোঝ না; fifteen years' service। বড় ভয়ে-ভয়ে, বুঝে-সুজে হুঁসিয়ার হয়ে তবে কাজ করতে হয়। লোকটার কি আক্কেল দেখ দেখি! বলি, শ্যাম দা' কি তোমার মেসো, না পিসে, না ভগ্নীপতি যে, এত ডাকা-ডাকি করে শুধু দুটো বাজে কথা কইতে হবে? ধানের আড়তদার কিনা, তাই ঐ রকম 'ধান-কাটা' বুদ্ধি।"

শরৎ হাসিতে হাসিতে কহিল—"আচ্ছা, শ্যাম দা,'—"

"হাসি নয় শরৎ, ব্যাপার খুব সঙ্গীন জেনো। ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের ফটকে বড় মিত্তির বেটা যদি দেখতে পেয়ে থাকে, তা হ'লে জানবে—সর্বনাশ। এই পনর বচ্ছর 'সার্ভিস' করছি, পনর বচ্ছরই বেটা পেছনে লেগে আছে। না—শরৎ, যা বলছিলুম; চাকরি আমি সত্যই ছেড়ে দোবো।"

"দিয়ে চাষ-বাসে লাগবে?"

"হ্যাঁ। আচ্ছা, সোমেশ যদি একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দেয়, তা' হলে ওর মত, সব কাগজে কবিতা-গল্প-টল্প লিখতে পারব না? তা পারব বোধ হয়। তা' হলে তা'তেও কিছু কিছু হবে।"

মনে মনে শরৎ হাসিয়া কহিল—"তা, তাই হবে'খন। ঐ গাড়ী এসে পড়েছে, চল এখন, গিয়ে সব উঠে বসি।"

সাড়া শব্দ করিয়া কাটোয়ার গাড়ী আসিয়া প্ল্যাটফরমে লাগিল।

(৫

রতনপুর। শ্যাম দা'র গৃহ।

কাজ-কর্ম্ম সব শেষ হইয়া গিয়াছে। বিয়ের উপলক্ষ্যে আগা-গোড়া যাহা খরচ হইয়াছে, শ্যাম দা' তাহার হিসাব লিখিতে বসিয়াছেন। কাল তাঁহার দশ দিনের ছুটি শেষ। কালই তাঁহাকে চলিয়া যাইতে হইবে। খালি খরচপত্রের হিসাবটা একবার মিলান দরকার।

সেদিন আফিসের ৪১২৯৷৵৮ পাইয়ের হিসাবটা মিলাইতে না পারিলেও, শ্যাম দা' হিসাবে কিন্তু খুব পাকা। তাঁহার কাছে একটী আধলা গরমিল হইবার যো নাই। বিয়ের বাবদ তাঁহার কাছে ছিল—সর্ব্বসমেত ৫১৭৷৷৶০ আনা। কিন্তু সব রকম খরচ লিখিয়া শ্যাম দা'র 'টোট্যাল' হইতেছে ৫৩৬৸৶০। তের আনা পয়সা আর কিছুতেই মিলিতেছে না। একবার, দুইবার, তিনবার যোগ দেওয়া হইল; —সেই ৫৩৬৸৶০ আনা। শ্যাম দা'র মাথা ঘুলাইয়া গেল। আর ৸৶০ আনার হইল কি? সকলেই সেখানে বসিয়া ছিলেন। গৌরকিঙ্কর কহিল—"যাক গে ৸৶০। তের আনার জন্তে আর অত মাথা ঘামিয়ে দরকার নেই দাদা।"

"তা কি হয় রে বোকা, ৸৶০ আনা যাবে কোথা? মিলতেই হবে।"

শ্যাম দা'র বৃদ্ধ পিতা হেমবাবু তক্তাপোষের একধারে শুইয়া ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"শুধু তের আনা?"

গৌরকিঙ্কর কহিল—"হ্যাঁ।"

শরৎ বলিল—"চারটে পয়সা হাওড়ায় যে সেই ভিখিরীকে দিয়েছিলে,—যাকে বললে—আশীর্ব্বাদ কর, যেন যদু মিস্তির না দেখতে পেয়ে থাকে ?"

"ঠিকই বটে। কিন্তু ও ত চার পয়সা, আরও বার আনা যে চাই।"

শচীন লাফাইয়া উঠিল,—"কাকা, Father expired-এর বার আনা যে আমায় দিয়ে গিয়েছিলে, সেটা ধরেছ ত ?"

হেমবাবু কহিলেন—'Father expired ? ব্যাপারটা কি ?"

শ্যাম দা' তাড়াতাড়ি কথাটাকে চাপা দিবার অভিপ্রায়ে বলিয়া উঠিলেন—"ও কিছু নয়। বাবা, আপনি আজ ওষুধ খেতে ভোলেন নি ত ?"

যাক হিসাব ঠিক মিলিয়া গেল।

* * *

আবার ব্যাণ্ডেল ষ্টেসন।

শ্যাম দা' সকালের ট্রেণে কলিকাতা ফিরিয়া যাইতেছেন। দশটায় হাওড়ায় পৌছাইয়া সরাসরি তাঁহাকে আফিস করিতে হইবে। সঙ্গে আছে শরৎ।

"দেখ শরৎ, একটু একটু লিখতে সত্যিই আমি অভ্যাস করব। সোমেশ বই লিখে বছরে চার পাঁচ হাজার পায়, আমি চার পাঁচ শ'ও ত পাব বটে। বাড়ীতে বসে কাল একটু চেষ্টা কচ্ছিলুম।"

"কবিতা না গল্প ?"

"কবিতা। কবিতা ক' লাইন কিন্তু বেশ মিলিয়ে ফেলেছিলুম। মনে আছে আমার। শুনবে ?—

—চৌ-চৌ—

ধীরি ধীরি বয় মৃদুল বায়,
ধীরি ধীরি ফুল দুলিছে তায়,
আকাশে সোনালী রংয়ের খেলা,
গাঁথিছে কে আজ চিকণ মালা?
নীরবে একেলা, কে তুমি গো বালা,
কে তুমি গো অবগুণ্ঠনা ?—

—"শরৎ, শরৎ! সর্ব্বনাশ! আসল কাজেই একেবারে ভুল!" বলিয়াই শ্যাম দা' লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। "ট্রেণ আসবার আর দেরী কত বল দেখি?"

"তা আধ ঘণ্টার ওপর হবে। কেন? হঠাৎ তোমার আবার হোল কি?"

"হোল আমার মাথা আর মুণ্ডু! Father expired—নেড়া হতে হবে না? উঃ! ভাগ্যিস্ মনে পড়ে গেল! নইলে এই এক মাথা চুল শুদ্ধ আফিসে গিয়ে পড়লেই—ঐ একটা নাপিত রাস্তার ধারে বসে রয়েছে,-ডাক—ডাক ওকে শীগ্গীর।"

শীগ্গীরই নাপিতকে ডাকিয়া আনা হইল এবং শ্যাম দা' ব্যস্ত হইয়া মাথাটা তাহার দিকে আগাইয়া দিলেন।

আসক্তির শক্তি

(১)

—১২৮৬ সাল—

১২৮৬ সালের এক বৈশাখী অপরাহ্ণ। আকাশে কাল-বৈশাখীর সূচনা লক্ষ্য করিয়া বিন্দুবাসিনী তাড়াতাড়ি নদীর ঘাট হইতে গা ধুইয়া ও এক ঘড়া জল কাঁখে করিয়া দ্রুতপদে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল।

ঘড়াটি দাওয়ার উপর রাখিয়া, রোয়াকের উপর উঠিয়া দাঁড়াইতেই বিমল কিছুক্ষণ তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া কহিল—"ভগবান্ যাকে দেন, সব দিক দিয়েই দেন; আবার যাকে দেন না, কোন দিক দিয়েই দেন না; একেবারেই তারে নিঃস্ব করেই ছাড়েন।"

হাতের গামছাখানা নিংড়াইতে নিংড়াইতে বিন্দু কহিল,—"কি গো, গ্রন্থ-ট্রন্থ কিছু লিখতে সুরু করেছ বোধ হয়? ক'রে থাক যদি, তা হ'লে উপন্যাস কিছুতেই নয়,—নিশ্চয়ই কোন তত্ত্বকথা সম্বন্ধেই হবে। না গা?"

"ঠিকই তাই। সৃষ্টিতত্ত্ব। ভগবান্ এক জনকে—এই ধর গিয়ে, তোমাকেই—তাঁর ভাঁড়ারে যত রূপ ছিল, সব ঢেলে দিয়েই তৈরী

করলেন, আর ওদের দুগ্‌গাটার সামান্য একটু রূপের জন্যে বিয়েই হচ্ছে না। চোদ্দ বছরের ধেড়ে মেয়ে হতে চল্লো, এখনও আইবুড়ো হয়েই রইল।"

"সত্যি, বড় অবিচার বটে।"

"তবে, তোমার ক্ষেত্রে, অবিচারটা যদি আর এক দিক দিয়ে জানিয়ে না দিতেন, তা হ'লে তার তীব্রতাটা বড়ই চোখে লাগতো।"

বিন্দু দালানের মধ্যে গিয়া ভিজা কাপড় ছাড়িল, তৎপরে রোয়াকে আসিয়া কহিল—"কি বলছো?"

"এই ধর, তোমার বাইরের রূপটা যত বড় ক'রে সৃষ্টি করেছেন, ভেতরের রূপটাও যদি সেই রকম বড় ক'রে সৃষ্টি না করতেন—"

"তা হ'লেই মাকাল-ফল হয়ে যেতুম। কিন্তু মাকাল-ফলও কি একটা অষুধে লাগে শুনেছি। তা এখন সৃষ্টিতত্ত্ব রেখে দিয়ে, খানিকটা ঘুরে-ফিরে এস; নইলে ও-বেলার মত এ-বেলাও হয় ত ক্ষিধে হবে না।"

বাইরে কোথাও আর যেতে ইচ্ছে করছে না। বাড়ীর মধ্যেই খানিক ছুটোছুট করবো। লুকোচুরি খেলবো—তুমি আর আমি," বলিয়া বিমল বাহির-বাটীর দিকে গেল এবং সদরের দরজাতে খিল লাগাইয়া দিয়া আসিল। তার পর বিন্দুর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—"আমিই চোর। লুকোও গে। উঠোনের এই আমগাছটাই বুড়ী।

মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে বিন্দু কহিল—"আমার সঙ্গে খেলায় কেবলই ত তুমি চোর হও। তোমার মত চিরকালের চোর নিয়ে ঘর করা—সত্যি বড় ভয়ের কথা।"

এই দু'টি স্বামি-স্ত্রীর—এই দু'টি যুবক-যুবতীর—এইরূপ লুকোচুরি খেলা

আজ নূতন নহে। সংসারে আর দ্বিতীয় কেহ নাই। বিমল যখন ষোল বছরের আর বিন্দু নয় বছরের—তখন তাহাদের বিবাহ হইয়াছিল। তখন হইতে এক যুগ কাটিয়া গিয়া উভয়কে তরুণ-তরুণীর স্থান হইতে অনেকটা সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছে। এখন বিমলের বয়স ২৮, বিন্দুর ২১। এই বয়সে সদর দরজায় খিল দিয়া স্বামি-স্ত্রীতে লুকোচুরি খেলা—যেমন অসাধারণ, তেমনই বে-মানান। কিন্তু ইহারা খেলিত। উঠানের আমগাছকে বুড়ী করিয়া কখনও বিন্দু লুকাইত, বিমল চোর হইত; কখনও বিন্দু চোর হইত, বিমল লুকাইত। বিমলের স্বর্গীয় জননী, তাঁহার বড় আদরের একমাত্র কিশোর পুত্র ও পুত্রবধূকে এইরূপ ছেলেখেলা খেলিতে উৎসাহিত করিতেন। কোন জননীর পক্ষে ইহাও বোধ হয় অসাধারণ। কিন্তু বিমলের মাতা ইহাতে গভীর আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করিতেন। আজ তিনি বাঁচিয়া নাই এবং ইহারাও আজ তখনকার দিনের মত কিশোর-কিশোরী নয়, কিন্তু তবুও ইহাদের যুগপূর্ব্বের সেই অভ্যাসটি একেবারে যায় নাই। মধ্যে মধ্যে প্রেম-দেবতার খেয়ালী হাতের নাড়া পাইয়া ইহাদের মনের মাঝে সেই ছেলেখেলার সাড়া পড়িয়া যায়। শোভন অশোভন, উচিত অনুচিত তাহারা ভাবে না; ভাবিবার আবশ্যক মনে করে না। সুপ্রশস্ত নির্জ্জন বাটীর মধ্যে এক জন মালকোঁচা ও আর এক জন গাছ-কোমর বাঁধিয়া লুকোচুরি খেলার সূত্রে ছুটাছুটি করে।

আজও তাহাই করিল।

অবশেষে সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিলে, 'আব্বা' দিয়া বিন্দু রোয়াকের এক ধারে বসিয়া পড়িল। বিমলও তাহার পার্শ্বে বসিয়া

পড়িল। উভয়ের সুন্দর, স্বাস্থ্যপূর্ণ, শক্তিশালী দেহ ঘামে ভিজিয়া উঠিয়াছিল। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর বিন্দু সন্ধ্যা দিতে উঠিয়া গেল, বিমল বসিয়া রহিল। তাহার মাথার উপর, আকাশের গায় এক ফালি চাঁদ উঠিয়াছিল। দক্ষিণের বাতাস পাঁচীলের ধারের নারিকেল গাছগুলির মাথায় উঠিয়া, তাহাদের পাতাগুলিকে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল। দূরের কোন একটা গাছ থেকে একটা পাখী অনবরত একঘেয়ে সীস্ জুড়িয়া দিয়াছিল।

রাত্রিতে আহার শেষে তামাক খাইতে খাইতে বিমল কহিল—"বিন্দু, বড় সুখেই আমি আছি, কিন্তু মাঝে মাঝে একটা ভয় হয় যে, এ সুখ যদি আমার হঠাৎ—। সুখই বলছি ; যদিও পয়সা-কড়ি নেই, বিষয়-সম্পত্তিও নেই, কিন্তু তোমাকে স্ত্রীরূপে পেয়ে আমি ওসবের অভাবকে অভাব বলেই গ্রাহ্য করি না।" তার পর হুঁকাতে দুই চারিটা টান দিয়া আবার কহিল.—"আমি তোমায় পেয়ে সুখী বটে, কিন্তু তোমাকে ত সুখী করতে পারলুম না, বিন্দু। একখানা গয়না কি একখানা ভাল কাপড় পর্যন্ত তোমাকে দিতে পারিনি, পারবও না। তাই ভাবি যে, আমি সুখী বটে, কিন্তু তোমার দুঃখের আর অন্ত নেই। রাজা-জমিদারের ঘরেই তোমায় মানায়, বিন্দু, আমার মত দীন ভিখিরীর ঘরে তোমায় মানায় না।"

"তোমার কাছেই আমায় মানায়। আমি যে জন্ম-জন্মই তোমার। আমি কি তোমার ঘর ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারি? তুমি কি মনে কর, আমি শুধু এই জন্মেই তোমার স্ত্রী হয়ে এসেছি? তা মনেও করো না। জন্ম-জন্মই এই দু'টি পায়ের তলায় আশ্রয় পেয়ে এসেছি—জন্ম জন্মই পাবো," বলিয়া বিন্দু বিমলের পায়ের উপর তাহার পদ্মমুখ রক্ষা করিল।

ঘরের এক কোণে পিলসুজের উপর মোটা পলিতা দেওয়া রেড়ির তৈলের প্রদীপ জ্বলিতেছিল। মুক্ত জানালা দিয়া, সন্ধ্যার সেই চাঁদের কালিটুকু তখন পশ্চিমাকাশে অনেকখানি নামিয়া পড়িয়াছিল। তাহারই স্নিগ্ধ ক্ষীণালোক প্রদীপের স্নিগ্ধালোকের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। ওপাশের বাড়ীর নন্দ বৈরাগী বাউলের সুরে তখন একখানা গান ধরিয়াছিল :—

সেই প্রেমেতে বাধ্ রে নাগরে।
যে প্রেমেতে উর্দ্ধে তারে—যাবে নিয়ে—
বন্দী ক'রে রাখবে না ঘরে।

(২)

—১২৯০ সাল—

বেলা প্রায় দেড় প্রহরের সময় পাড়া হইতে দুইটি খবর সংগ্রহ করিয়া বিমল বাটী প্রত্যাগত হইল। প্রথম খবর—গাঙ্গুলী-বাড়ীর নূতন জামাই নরহরি আজ কয় দিন হইল শ্বশুরালয়ে আসিয়াছে এবং কয় দিনই আহারাদির পর সমস্ত মধ্যাহ্নকালটা, বহির্ব্বাটীর পরিবর্ত্তে তাহাকে অন্দরের ঘরের মধ্যেই স্থান দেওয়া হইতেছে এবং সে ঘরে তাহার নব-পরিণীতা বধূ বিরজা সুন্দরী না কি যাতায়াত করিয়া থাকে। গাঙ্গুলী-বাড়ীর এবম্বিধ অনাচার—অর্থাৎ দিবাভাগে স্বামিস্ত্রীর মধ্যে এরূপ দেখা-সাক্ষাৎজনিত অপরাধের বিচার করিতে ও-পাড়ার লোক গোপনে কমিটী বসাইয়াছে এবং জয়কালী গাঙ্গুলীর প্রতি কি ভাবে এবং কোন্ শ্রেণীর সামাজিক শাস্তির প্রয়োগ বিধেয়, তাহারই কল্পনা-জল্পনা চলিতেছে। বিমলের নিকটও তাঁহারা পরামর্শ-প্রার্থী হইয়াছেন। অধিকাংশের যেরূপ মত হইবে, বিমলেরও তাহাই, এই কথা জানাইয়া বিমল চলিয়া আসিয়াছে।

দ্বিতীয় খবর এই যে, বিন্দুকে শীঘ্রই একবার কলিকাতায় কালীঘাটে যাইতে হইবে এবং সেখানে কালীমন্দিরের অভ্যন্তরে—উত্তরদিকে যে সুবৃহৎ মনসাগাছ আছে, তাহাতে কাপড়ের কালিতে বাঁধিয়া ঢেলা ঝুলাইয়া আসিতে হইবে।

ও-পাড়ার রাঙ্গা ঠান্‌দি বিমলকে ডাকিয়া আজ ধরিয়া বসিয়াছে যে,

বিমল ও বিন্দু বৌকে তিনি রামসীতা বলিয়াই মনে করেন। তাঁর এইরূপ মনে করার মধ্যে কোন ভুলই নাই। তারা দু'টি ঠিকই ত্রেতার রামসীতা। দু' একটি ছেলে-মেয়ে না হইলে তাদের যেন মানাইতেছে না। তাই তাঁর উক্তরূপ আদেশ জারি হইয়াছে। কালীঘাটের মনসাগাছে ঢেলা বাঁধিয়া দিয়া আসিলেই বিন্দুর কোলে লব-কুশের আগমন অব্যর্থ।

সমস্ত শুনিয়া, মুখে সাড়ীর অঞ্চল চাপা দিয়া বিন্দু ও-ঘরের দিকে পালাইয়া গেল। বিমল তাহার অনুসরণ দ্বারা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল—"পালিয়ে এলে হবে না। রাঙ্গা ঠান্‌দির হুকুম,—তামিল করতেই হবে। নইলে, কবে হয় ত তিনি নিজেই তোমাকে টেনে নিয়ে হুগলীর ইষ্টিশনে গিয়ে রেলে উঠে বসবেন।"

এই কথার পর অনেক দিন বিন্দুর মনে চুপিসাড়ে কালীঘাট যাওয়ার কথা অনেকবার উঁকি দিয়া গিয়াছে। তাহার অন্তঃকরণে মা হইবার বাসনার একটা নাড়া আসিয়া লাগিয়াছে। এরূপ সময়ে খানিক ভাবিয়া অবশেষে সে নিজের মনে বলিয়াছে—বেশ আছি, আর ছেলের দরকার নেই। এই অভাবের সংসারে আমাদেরই দুটো পেট চলা ভার, এর ওপর ছেলেপুলে না হয়েছে—ভালই হয়েছে। ওঁকে সুখী ক'রে, ওঁর পায়ের তলায় আ-মরণ এই ভাবে কাটিয়ে যেতে পারলেই আমার সাধ ষোল আনা পূর্ণ হবে। কালীঘাট!—হ্যাঁ, আছে বটে। মন্দিরের ঠিক উত্তরেই বাঁধানো ষষ্ঠীতলা। কত দেশ-দেশান্তরের মেয়েরা সেই মনসাগাছে ঢিলি বেঁধে দিয়ে যায়। আমার বিয়ের আগে আমরা যে সেই গিয়েছিলুম। মা, ঠাকুরমা, বৌদিদি, ও-বাড়ীর গঙ্গা-পিসী, মোড়লদের ছোট-গিন্নী, ন'কাকা, আরও সব কত কে। মেমারী থেকে রেলে চেপে হাওড়ায়

নামলুম ; তার পর গঙ্গা পেরিয়ে কতকটা পথ ঘোড়ার গাড়ীতে এসে, এক যায়গাতে সব ট্রামগাড়ীতে উঠলুম। কেমন রেলগাড়ীর মত ছোট ছোট, দু'খানা ক'রে গাড়ী, একখানা এঞ্জিনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আগে আগে এক জন ভুড়ুক-সওয়ার ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে লাগলো। সে সব না কি এখন আর নেই,—এখন না কি ঘোড়াতেই গাড়ী টানে। কি যায়গা গো! আদিগঙ্গার ধারে হোগলা-ঘেরা ঘরে তিন দিন আমরা ছিলুম। কি নোংরা! পথের দু'পাশে কত বড় বড় পচা নর্দ্দামা! কত এঁদো পুকুর! আমাদের মোড়লপুর ওর চেয়ে সোণার চাঁদ যায়গা।

এই রকম ভাবিতে ভাবিতে বিন্দু এক বিষয় হইতে আর এক বিষয়ে আসিয়া পড়ে। তাহা হইলেও মূলে ঢেলা-বাঁধার কথাটা তাহার মনে ঠিকই উঁকি দিয়া যায়। যদি কোন দিন বিমল পুরাণো কথাটার উল্লেখ করিয়া উত্তরের প্রতীক্ষায় বিন্দুর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে, বিন্দু বলে—"কি হবে ছেলেপুলে? একে আমাদের এই গরীবের সংসার, তার পর ধর গিয়ে—"বলিয়া বিমলের কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপি চুপি বলে—ছেলেপুলে হ'লে তোমার ওপর আমার ভালবাসার ভাগাভাগি হয়ে যাবে।" বলিয়াই মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বিন্দু ছুটিয়া পলাইয়া যায়।

সত্যই গরীবের সংসার। সাবেককালের পিতৃ-পিতামহ-পরিত্যক্ত প্রকাণ্ড বাড়ীখানাই আছে, আর কিছু নাই। তাঁহাও চারিধারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, মেরামতের পয়সা নাই। বিন্দু কোন কষ্টকেই কষ্ট বলিয়া গ্রাহ্য করে না, তাই সাংসারিক এই অস্বচ্ছলতাকে সে মোটে আমল দেয় না। আর বিমল বলে—'যার বিন্দু আছে, তার খাবার কষ্ট কি?' তবুও

পাড়ার পাঁচ জনে ইহাদের উদ্দেশে বলে—"আহা!" এই 'আহা'র মানে —এমন সুন্দর স্বামি-স্ত্রী, এমন মধুর চরিত্র ইহাদের, যেন কলির লক্ষ্মী-নারায়ণ, কিন্তু দু'টি শাক-ভাতেরও বুঝি বা বারো মাসের সংস্থান এদের নাই।

বাঁড়ুয্যেদের ছোটকর্ত্তা বাড়ী আসিয়াছেন। গাঁয়ের মধ্যে একমাত্র তিনিই গাঁ ছাড়িয়া বাহিরে থাকেন। কলিকাতায় লাহাদের সূতার কারবার আছে, তিনি সেইখানে কায করেন। দেশ ছাড়িয়া কলিকাতায় থাকা, সকলেই দুরদৃষ্ট বলিয়া মনে করিত; কেহ থাকিতও না। বাঁড়ুয্যেদের ছোটকর্ত্তা এবার ছয় মাস পরে বাটী আসিয়া বিমলকে ডাকিয়া কহিলেন—"আমাদের সূতোর কারবারে তোমার একটা কাযের ঠিক করেছি। খাওয়া পাবে, থাকবার যায়গা পাবে, আর মাসে সাত টাকা ক'রে নগদ পাবে। তা' ছাড়া পূজোর সময় নতুন ধুতি-চাদর।" এই শুভ-সংবাদে পাড়ার সকলেরও আনন্দ হইল। সকলেই ইহাদিগকে ভালবাসে। বিমল ও বিন্দুর অন্তঃকরণ ছোটকর্ত্তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া গেল। এক জনের খোরাকটা বাঁচিয়া যাইবে; তার উপর বৎসরে প্রায় একশতটি করিয়া টাকা পাওয়া যাইবে। তা' হলেই আর কোন অভাব-অনটন থাকিবে না। উপরন্তু দু'একটা ভালমন্দ জিনিষ বিন্দুকে দিতে পারা যাইবে।

ভিতরে ভিতরে সব বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। বিন্দুর কাছে রাত্রিতে নেড়ার মা শুইবে। সে-ই দোকান-হাট করিয়া দিবে। বিমল ছ'মাস অন্তর ৫ দিনের ছুটীতে বাটী আসিবে। কলিকাতা হইতে দল বাঁধিয়া এ অঞ্চলে প্রায়ই সব আসিয়া থাকে। আবুইহাটী, নলডাঙ্গা, ছাতিমপুর

বিলসরা, সিমলেগড়, সাতশিমূল প্রভৃতি গ্রামের অনেক লোক আজকাল দল বাঁধিয়া প্রায়ই কলিকাতা যায়-আসে। যাদের পয়সা আছে, তারা রেলে চেপেও যাতায়াত করে। কিন্তু তেমন লোক আর কয়টা? সবে ত বিশ পঁচিশ ক্রোশ পথ। হাঁটিয়া আসিতে দুইটা দিনের বেশী লাগে না। মধ্যে সেওড়াফুলিতে এক রাত না কাটাইলে সন্ধসন্ধই আসা যায়। তবে দশ-বিশ জন মিলিয়া একসঙ্গে না আসিলে হয় না। কেন না, পথে একটু ভয়ের কারণ আছে। তবে, ঠ্যাঙ্গাবাড়ীর মাঠে আগের চেয়ে ঠ্যাঙ্গাড়ের ভয় এখন অনেকটা ক'মে এসেছে,—নেই বল্লেই হয়।

বিমলের কলিকাতা আসিবার দিন যতই কাছে আসিতে লাগিল, ততই তাহার মুখভাবে চিন্তা জমিয়া উঠিতে লাগিল। বিন্দুর সদা-প্রফুল্ল মুখেও হাসি যেন ক্রমেই অন্তর্হিত হইতে লাগিল। বাহিরে যাহাই হউক, অন্তরে অন্তরে একটা স্বস্তির নিশ্বাস উভয়ে নিশ্চয়ই ফেলিয়াছে। এইবার সংসারের অনটন আর বড় একটা রহিবে না, এইবার হয় ত বিমল বিন্দুর অঙ্গে দু'একখানা ভাল কাপড় পরাইতে পারিবে। দু'চার বৎসর পরে একখানা সোনার জিনিস হয় ত বিমল এইবার বিন্দুর গায়ে দেখিতে পাইবে।

কলিকাতা যাইতে আর ছয়টা দিন বাকী আছে। বাড়ুয্যেদের ছোট কর্ত্তা বিমলের কাছে আসিয়া বলিলেন--"গোছ-গাছ সব সেরে ফেল, বিমল।" বিমল কহিল--"সবই আমার ঠিক, কাকামশাই।"

আর পাঁচ দিন।

আর তিন দিন।

মধ্যে আর একটি দিন মাত্র বাকী।

যাইবার আগের দিনের সন্ধ্যা। বিন্দু বেলাবেলি রাত্রির আহার প্রস্তুত করিয়া, সন্ধ্যা হইতে না হইতে, নদীর ঘাট হইতে গা ধুইয়া, কাপড় কাচিয়া আসিয়াছিল। সেই সঙ্গে নদীর জলে দু'চার ফোঁটা চোখের জলও হয় ত মিশাইয়া আসিয়াছিল। এখন দালানের প্রদীপের সম্মুখে বিমলের কাছে নীরবে বসিয়াছিল। আজিকার রাত্রি-প্রভাতেই বিমল বাটী ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। বহুক্ষণ নীরবতার পূর্ব্বে সেই কথাই বোধ হয় দম্পতির মধ্যে হইতেছিল।

নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বিমল কহিল—"সকাল সকাল খেয়ে নেওয়া যা'ক, ভাত দেবে চল। কিন্তু—"

বিন্দু কহিল,—"চল ভাত দি; খেয়ে-দেয়ে নাও। তবে—"

বিমল একটু ম্লান হাসিয়া কহিল—"আমার 'কিন্তু' আর তোমার তবে'—যা বলতে চায়, সেটা একই কথা না কি?" বলিয়াই বিমল উঠিয়া ঘরের মধ্যে যাইল এবং দুই টুকরা কাগজ ও দোয়াত কলম আনিয়া, প্রথমে এক টুকরাতে নিজে কি লিখিল। তারপর অপর টুকরাটা বিন্দুর হাতে দিয়া বলিল—"তবে'র পর যেটা বলতে গিয়ে বললে না, সেটা সত্যি ক'রে এতে লেখ ত বিন্দু। ঠিক লিখো; যেটা বলতে যাচ্ছিলে; মিথ্যে কিছু লিখো না—আমার দিব্বি। দেখি, আমার 'কিন্তু'র সঙ্গে মিলে যায় কি না।"

একইরূপ ম্লান হাসি হাসিয়া, বিন্দু কাগজখানিতে কি লিখিল। প্রদীপের আলোকে উভয় কাগজই একসঙ্গে বিমল মেলিয়া ধরিল। বিমল লিখিয়াছে—'কিন্তু তোমায় ছেড়ে কোথাও আমি থাকতে পারব না, সুতরাং আমি যাব না।' আর বিন্দু লিখিয়াছে—'তবে, তোমায় ছেড়ে

বাঁচাটা কি আমার সম্ভব হবে? দুঃখ না ঘোচে, না-ই ঘুচুক; তোমার যাওয়া হবে না।'

হরি বোল্—হরি!

বাঁড়ুয্যেদের ছোটকর্ত্তা পরদিন প্রত্যূষে একাকীই চলিয়া গেলেন।

এ কয় দিনই বিমল কেবলই ভাবিয়াছে—কি করিলে আর যেতে হয় না। হঠাৎ একটা খবর আসে যে, আর লোকের আবশ্যক নেই, তা' হলে সে বাঁচিয়া যায়। কিম্বা ছোট কর্ত্তা কোন কারণে বিরক্ত হয়ে না নিয়ে যান! ক'দিন ধ'রে খুব ঝড়-বৃষ্টি হয়!—কিছু না হয়, তবুও আমি যাব না—কিছুতেই যাব না।

আর বিন্দু এ কয় দিন কেবলই বলিয়াছে—'হে ঠাকুর, হঠাৎ এ কি হল? ওঁকে ছাড়া হয়ে আমি বাঁচবো কি ক'রে? আমাদের দুঃখু ঘুচে কাজ নেই, ওঁর যাওয়া যেন না হয়। যাবার আগে হঠাৎ যেন আমার খুব অসুখ করে।'

রাঙ্গা ঠানদি এক দিন আসিয়া বলিলেন—"ওরে, যেখানে লক্ষ্মী, সেইখানেই যে নারায়ণ; কখনও কি ছাড়া-ছাড়ি হয়?"

ঠিক তখন, সেদিনের মত নন্দ বৈরাগীর সেই বাউল-গানখানা শুনিতে পাওয়া গেল।

সেই প্রেমেতে বাঁধ্ রে নাগরে।
যে প্রেমেতে উর্দ্ধে তারে যাবে নিয়ে—
বন্দী ক'রে রাখবে না ঘরে।

৩

—১৩০২ সাল—

দ্বাদশ বৎসর পরে।

এই এক যুগ সময়ের মধ্যে জগতে কত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। কত সুখের সংসারে দুঃখের বান ডাকিয়া, তাহাকে অথৈ জলের মধ্যে ডুবাইয়া দিয়াছে। আবার কত দুঃখের সংসারে, সুখসূর্য্য উদয় হইয়া, নব কিরণসম্পাতে তাহার আঁধাররাশিকে তাড়াইয়া দিয়াছে।

পলাশদীঘি গ্রামের বাঁড়ুয্যেদের ছোটকর্ত্তা সুতার কারবারে কাজ করিতে করিতে আজ বছর কয়েক হইল মারা গিয়াছেন। গাঙ্গুলীবাড়ীর সেই বিরজা বলিয়া মেয়েটি, যাহার সহিত নরহরির বিবাহ হইয়াছিল, সে বিধবা হইয়াছে। দুর্গার ভাল যায়গায় বিবাহ হইয়া, সে দুইটি ছেলে ও একটি মেয়ের মা হইয়াছে। তাঁতিদের প্রকাণ্ড কোঠা উঠিয়াছে। নদীতে কচুরিপানা জন্মিয়া তাহা বুজিয়া গিয়াছে, তাহার ঘাট ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কেহ বড় একটা আর নদীতে স্নান করিতে বা কাপড় কাচিতে নামে না। মধ্যের পাড়ার চিরকালের বারোয়ারী পূজা, পরস্পর মনোমালিন্য হইয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নন্দীদের প্রকাণ্ড বাড়ী ভূমিসাৎ হইয়াছে। মুখুয্যেরা দেশ ছাড়িয়া, পশ্চিমের কোথাও গিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহাদের 'আনন্দ-কাননে'—রাজ্যের সাপ, শিয়াল আর

জংলী-গাছের আড্ডা হইয়াছে। রাঙ্গা-ঠানদির আসন্ন সময়; তিনি মৃত্যু-শয্যায় শায়িতা। আর এক জন হঠাৎ মারা গিয়াছে। সে সেই নন্দ-বৈরাগী। মোট কথা,—বহুকালের ক্ষুদ্র গ্রামখানির উপর দিয়া, দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে পরিবর্ত্তনের একটা ওলট-পালট খেলিয়া গিয়াছে।

বিমল ও বিন্দু,—তাহারা কিন্তু ঠিক তেমনিই আছে। তাহাদের বাহিরের দেহ দু'খানাতে, বারো বৎসরের দুঃখকষ্টের বারো শ ঢেউ লাগিয়া হয় ত তাহাদের নাড়াইয়া দিয়া গিয়াছে, কিন্তু অন্তরে তাহারা দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বের মতই আছে। তবে, হয় ত তাহারা সন্ধ্যাবেলা, উঠানের আমগাছকে বুড়ী করিয়া আগের মত লুকাচুরি আর খেলে না; হয় ত উভয়ের মনের ভাব, কাগজ-কলম লইয়া লিখিয়া দেখায় না। দুঃখ—দুই জনকে অনেক সহ্য করিতে হইয়াছে। তাহা বুঝিতে পারা যায়—তাহাদের উভয়েরই দৈহিক সৌন্দর্য্যের পরিপূর্ণ বিকাশ দেখিয়া। পূর্ব্বের সৌন্দর্য্যে বুঝি বা একটু জোয়ারের খরস্রোত ছিল, বুঝি বা একটু আবর্ত্তন ছিল, বুঝি বা একটু উচ্ছ্বাস, একটু চঞ্চলতা ছিল। দুঃখের ঘা খাইয়া এখন উভয়েরই তাহা—স্থির, ধীর, উচ্ছ্বাসহীন, আবেগহীন, অচঞ্চল। কয় বৎসর হইল তাহাদের সদর বাটীর পাঁচীল পড়িয়া গিয়া, ভিতরের কতক অংশ পথেরই সামিল হইয়া গিয়াছিল। এখন পথিকেরা পথ চলিতে প্রায়ই দেখিতে পায়—এই দুটি প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, বৈকুণ্ঠের এই লক্ষ্মী-নারায়ণ, হয় বাহিরের রোয়াকে, নয় ত বা মুক্তদ্বার দালানের মধ্যে বশিষ্ঠ-অরুন্ধতীর মত বসিয়া রহিয়াছে।

আগের বছর এ অঞ্চলে মোটেই ফসল হয় নাই, লোকে অর্দ্ধাহারে স্বল্পাহারে, অনাহারে কাটাইয়াছে। এ বছরও আকাশের লক্ষণ ভাল নয়।

লোকের চোখে-মুখে একটা আতঙ্কের ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। উত্তরের দিকে না কি দুর্ভিক্ষ দেখাও দিয়াছে।

অনেক গ্রাম ত্যাগ করিয়া অন্য কোথাও পলাইয়া যাইতেছে। যার কোথাও কেহ নাই, সে আকাশের দিকে চাতকের ন্যায় চাহিয়া দিন কাটাইতেছে। বিমলের যে কয়টি খোরাকীর ধান ছিল, তাহা নিঃশেষ হইতে আর বড় বিলম্ব নাই।

বিন্দু কহিল—"তুমি ভাবছ কেন? যা ধান আছে, আমি যদি এক বেলা ক'রে খাই, তা হ'লে ওতে আমাদের দু'মাস চ'লে যাবে।"

বিমল বিন্দুর সীঁথির প্রশস্ত সিন্দূর-রেখা ও তদুপরিস্থ সাড়ীর লাল পাড়ের উপর দৃষ্টি ফেলিয়া কহিল—"তার পর?"

"তার পর ভগবান্ ব্যবস্থা ক'রে দেবেন।"

"ভগবান এবার আর ব্যবস্থা ক'রে দেবেন না, বিন্দু। আর তা ছাড়া তুমি যে এক বেলা ক'রে খাবে, সে-ও ত আমি সহ্য করতে পারব না। চল, দিন থাকতে তোমায় মোড়লপুরে রেখে আসি। তোমার বাপের বাড়ীর দেশে 'ক্যানেলে'র জন্যে অজন্মা ত কোন বছর হয় না। ক'মাস সেখানে গিয়ে থাকলে, দু'বেলা পেট ভ'রে দু'টি খেতে পাবে।"

"আর তুমি?"

"কোন রকমে আমি নিজেকে চালিয়ে নেব, বিন্দু, দুঃখের এই দুর্দ্দিনে।"

"সুখের দিনে হ'লে, কোন রকমে কষ্ট স্বীকার ক'রে না হয় দিন কতকের জন্যে তোমায় ছেড়ে থাকতে পারতুম; কিন্তু দুঃখের

মাঝে তোমায় ফেলে আমি একটি মুহূর্ত্তও যে কোথাও গিয়ে থাকতে পারব না,—স্বর্গে গিয়েও না।”

কিন্তু পরের মাসেই দেশের অবস্থা এমন শোচনীয় হইয়া পড়িল যে, শেষ পর্য্যন্ত যাহারা একটা সু-রাহার অপেক্ষায় ছিল, তাহাদের মধ্যেও অনেককেই দেশত্যাগ করিয়া অন্যত্র কোথাও গিয়া আশ্রয় লইতে হইল। এমনই সময়ে, অনেক বুঝাইয়া, অনেক প্রকারে স্তোক-বাক্য দিয়া, মাত্র দু'টি মাসের কড়ারে বিমল বিন্দুকে ঘোড়লপুরে রাখিয়া আসিল। বিমলের ফিরিয়া আসিবার দিন বিন্দু নির্জ্জন গৃহমধ্যে তাহার পায়ের উপর মুখ রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—“বিয়ের পর থেকে আমি কখনও ঠাকুর দেবতাকে ডাকি নি। তুমিই আমার সাক্ষাৎ ঠাকুর, সহজ দেবতা! তোমাকেই সেবা ক'রে এসেছি, তোমা.কই পুজো ক'রে এসেছি। আজ তোমার কাছেই প্রাণের নিবেদন জানাচ্ছি—বেশী দিন আমাকে তোমা-ছাড়া ক'রে রেখো না।”

* * * * *

বিন্দুকে রাখিয়া আসিবার পর বিমলের দুই মাস কাটিয়া গিয়াছে। সে এখন লক্ষীছাড়া। সহস্র দুঃখ-কষ্টেও যে অনুপম শ্রী তাহার অক্ষুন্ন ছিল, এই দুই মাসের মধ্যেই সে শ্রী তাহার নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ভাঙ্গা বাড়ীখানারও যেন আগে একটা সৌষ্ঠব ছিল, তা'ও যেন বুড়ী রাক্ষসীর মত ভাঙ্গা দাঁতে আজ তাঁহার বিকট মুখ হাঁ করিয়া ভয় দেখাইতেছে!

বিমল এক বেলা দু'টি ভাত সিদ্ধ করিয়া লয়। সেই সঙ্গে কোন দিন কিছু হেলেঞ্চা, কোন দিন কিছু কলমী, কোন দিন বা আধখানা কাঁচা কলা, কোন দিন বা গোটাকতক ডুমুর তাহার মধ্যে ফেলিয়া

দেয়। দিনান্তে একবার অনেক বেলায় তদ্দ্বারাই উদরপূর্ত্তি করে। ঘরে-দুয়ারে আর ঝাঁটা পড়ে না; সন্ধ্যা দেখানো হয় না। তুলসী গাছ কয়েক গাছা শুষ্ক কাঠিতে পরিণত হইয়া, তুলসীতলার আচট্ মাটীর উপরে কোন প্রকারে দাঁড়াইয়া আছে। যে শাঁক বহুকাল ধরিয়া প্রতি সন্ধ্যায় বিন্দুর মুখের ফুঁয়ে বাজিয়া উঠিত, আজ সে দীর্ঘ দিনের ছুটী পাইয়া, তাহার গর্ভে কুমরে পোকাকে বাসা বাঁধিবার অধিকার দিয়া নিশ্চিন্তমনে কুলঙ্গীর কোণে পড়িয়া আছে।

শুধু দ্বিপ্রহরটাতে বিমল ঘরের মধ্যে শুইয়া থাকে ও আকাশ-পাতাল কি যে ভাবে, তা সেই জানে। সমস্ত প্রভাতকাল, অপরাহ্ণ ও সায়াহ্ন সে নদীর ধারে ধারে, মাঠে মাঠে, পথে পথে, এখানে সেখানে,—উদ্দেশ্যহীন, আশাহীন কর্ম্মহীনের মত ঘুরিয়া বেড়ায়।

'বোলুর মাঠে'র বিলের ধারে, যেখানে কয়েকটা শিরীষ আর মাদার গাছ সমস্ত স্থানটাকে ছায়া করিয়া রাখিয়াছিল, সে দিন অপরাহ্ণে বিমল সেইখানে গিয়া বিলের জলের দিকে মুখ করিয়া বসিল। পিছনের শিয়াকুল, বনযুঁই আর বৈঁচির ঘন ঝোপের অন্তরালে শ্রাবণের সূর্য্য তখন ঢলিয়া পড়িয়াছিল। পূবে হাওয়ায় বিলের জলে ছোট ছোট তরঙ্গ উঠিয়া সম্মুখস্থ পাড়ের গায়ে ছলাৎ ছলাৎ শব্দে আঘাত করিতেছিল। সেইখানে পাড় হইতে কিছু দূরে জলের উপর পাশাপাশি দুইটি রক্তকমল ফুটিয়া তরঙ্গাভিঘাতে অনবরত আন্দোলিত হইতেছিল। একটি বড় কমলের পার্শ্বে অপেক্ষাকৃত একটি ছোট কমল। একের স্কন্ধদেশে অপরের ছোট মুখখানি ক্রমাগত ঢলিয়া পড়িতেছে। বিমল একান্তমনে সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

ওপারে খেজুর-ঝোপের তলায় এক ঝাঁক ছাতার কিচির-মিচির জুড়িয়া দিয়াছিল। ডানার শব্দ করিয়া হঠাৎ তাহারা উড়িয়া গেলে, সোঁদাল গাছের ডাল হইতে উড়িয়া আসিয়া বসিল—এক জোড়া বন-কপোত-কপোতী। খানিকক্ষণ বিজয়ী বীরের ন্যায় গলা ফুলাইয়া আপন গৌরবগান গাহিতে গাহিতে পায়চারী করার পর কপোতটি ওধারে উড়িয়া গিয়া বসিল। সঙ্গে সঙ্গেই কপোতী তাহার অনুসরণ করিয়া তাহার পার্শ্বে গিয়া বসিল ও তাহার কণ্ঠনিম্নে আপনার মুখখানি রক্ষা করিল। পরক্ষণেই উভয়ে একসঙ্গে অন্যত্র উড়িয়া গেল। তন্ময় হইয়া এই সব দেখিবার কিছুক্ষণ পরে একটি সুদীর্ঘশ্বাস ধীরে ধীরে নিজের অজ্ঞাতসারে বিমলের অন্তর হইতে বাহির হইয়া গেল।

কয়েক দিন পরে হঠাৎ এক দিন কম্প দিয়া বিমলের খুব জ্বর আসিল। পাড়ার লোকে কেহই এ সংবাদ জানিতে পারিল না। তিন দিন ধরিয়া বিছানায় পড়িয়া সে ছট্‌ফট্ করিল। চতুর্থ দিনে কে জানিতে পারিয়া, গাঁয়ের ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিয়া দেখাইল। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া কহিল—"অসুখটা সোজা নয়—নিউমোনিয়া। দুই দিকই বেশী রকম 'য়্যাফেক্ট' করেছে; ভাল রকম তদ্বির চাই।" গ্রামের দুই চারি জন পরামর্শ করিয়া, মোড়লপুর হইতে বিন্দুকে আনয়ন করিল। বিন্দু আসিয়াই স্বামীর শিয়রে স্থান গ্রহণ করিল। একবার ঝুঁকিয়া তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া কহিল—"আমায় দূরে ঠেলে দিয়ে পালাবার যোগাড়ে আছ? কেন—কি অপরাধ আমি করেছি?" তাহার চোখের জলে বিমলের বুক ভিজিয়া উঠিল।

তার পর হইতে বিন্দুর সে কি অক্লান্ত স্বামিসেবা! দিনের পর দিন

কাটিয়া যাইতেছে; স্নান নাই, আহার নাই, নিদ্রা নাই,—মরণপথযাত্রী স্বামীকে ফিরাইয়া আনিবার সে কি উদ্দাম ব্যাকুলতা! কি প্রাণপণ আয়াস!

রোগের যন্ত্রণা যখন একটু কম থাকে, তখন বিমল বলে—"এত করেও বুঝি আমাকে ফেরাতে পারলে না! কি ক'রে তোমায় ছেড়ে যাব আমি?" তাহার দুই চোখ ভরিয়া জল জমিয়া আসে। বিন্দু আঁচল দিয়া তাহা মুছাইয়া দিয়া অশ্রু-আকুলকণ্ঠে কহে—"হয় তোমায় ফিরিয়ে আনবো, আর তা যদি না পারি, ত একলা তোমায় যেতে দেবো না, দু'জনে একসঙ্গেই যাবো, এ তুমি ঠিকই জেনো।" বিমল চক্ষু বুজিয়া নির্জীবের মত কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকে, তার পর আপনা-আপনি বিড়-বিড় করিয়া বলিয়া যায়—"দু'টি রক্তকমল! একসঙ্গে—পাশাপাশিই আছে! একসঙ্গেই কাঁপছে, দুলছে! একটি ছোট—একটি বড়। একটির কণ্ঠে আর একটির মাথা। কি গভীর ভালবাসা! কি মধুময় প্রাণ! কি কোমল সে প্রাণের আকর্ষণ!—আর সেই? সেই দু'টি বন-কপোত-কপোতী! উঃ! বিন্দু—বিন্দু!"

"ওগো, কেন তুমি অমন কচ্ছ?" বিন্দু বিমলের মাথার বালিসে মুখ গুঁজিয়া অজস্রধারে কাঁদিয়া যায়।

সে দিন শুক্লা সপ্তমীর রাত্রি। সন্ধ্যা হইতেই বাদল লাগিয়াছিল। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ঝড়েরও বিরাম ছিল না। মুহুর্মুহুঃ দমকা বাতাসের পাগল গর্জ্জন আর মুষলধারে বৃষ্টিপতনের শব্দ, জগতে যেন আসন্ন প্রলয়ের বার্ত্তা জ্ঞাপন করিতে লাগিল। মধ্যরাত্রিতে সামান্য কিছুক্ষণের জন্য ঝড়-বৃষ্টি একেবারেই কমিয়া আসিল। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে আকাশে ঘন

ঘন বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল। সেই সময় সারা পলাশ-দীঘি কাঁপাইয়া নিকটে কোথাও একটা ভয়ানক বাজ পড়িল। সেই শব্দে বিমল একবার কাঁপিয়া উঠিল। বিন্দু তাহার বুকটা চাপিয়া ধরিয়া, তাহার মাথার পার্শ্বে সোজা হইয়া বসিয়া রহিল।

পরদিন প্রাতে গ্রামের লোক শুনিল - গত রাত্রির দুর্য্যোগের মধ্যে বিন্দুর কোলে মাথা রাখিয়া বিমল পলাশ-দীঘির মায়া কাটাইয়া চলিয়া গিয়াছে।

—১৩১০—

হাওড়া জেলার ভাণ্ডারহাটির জমিদার শিবকালী রায় অপরাহ্ণকালে তাঁহার বহির্বাটীর বসিবার ঘরে ফরাস-বিছানার উপর তাকিয়ায় দেহভার রক্ষা করিয়া ধূমপান ও সংবাদপত্র, একসঙ্গে দু'টি জিনিষই উপভোগের চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার বাম হস্তে সুদীর্ঘ গড়গড়ার নল এবং দক্ষিণ হস্তে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র-'বসুমতী'। তামাকটা যে তিনি উপভোগ করিতেছিলেন, সে পক্ষে কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু 'বসুমতী'র যে স্থানটা তাঁহার চোখের সম্মুখে খোলা ছিল, সে স্থানটা বর্ণমালার অক্ষরাবলীতে পূর্ণ ছিল, কি কৃষ্ণবর্ণের রকমারি পোকা-মাকড়ের দল সরু সরু পায়ে সেখানটায় নিঃশব্দে চলিয়া বেড়াইতেছিল, তাহা তিনি ভিন্ন আর কাহারও সঠিকভাবে বলিবার শক্তি নাই। এ কথা বলিবার একটা কারণ আছে; এবং সে কারণটা এখনই জানিতে পারা যাইবে। তিনি ভৃত্য হরিদাসকে হাঁক দিলেন এবং সে আসিলে তাহাকে কহিলেন—"আজ আফিংটা বড্ড ধরেছে রে, হরিদাস! বাড়ীর ভেতর থেকে এক গেলাস গুড়ের সরবৎ আন্ দেখি। অমনি খবরটাও একবার নিয়ে আসিস্—বুঝতে পেরেছিস্?" হরিদাস সবই বুঝিয়াছিল; কিন্তু আমরা সকলকে একটু ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলি :—

জমিদার শিবকালী বাবুর বয়স পঞ্চাশ ছাড়াইয়া গিয়াছে। তাঁহার

গৃহিণীর ত্রিশ। অর্থাৎ তাঁহার প্রথম স্ত্রী কোন সন্তানাদি না রাখিয়া বছর পনর পূর্ব্বে মারা যাইলে, তিনি পুনরায় দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। বর্ত্তমান স্ত্রীর গর্ভেও এ যাবৎ কোন সন্তানাদি না হওয়াতে স্বামি-স্ত্রীর অন্তরে দুঃখের আর অবধি ছিল না। কিন্তু সহসা তাঁহাদের এই পরিণত বয়সে ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। গৃহিণী গর্ভবতী এবং আসন্ন-প্রসবা হইয়াছেন।

আজ দৈনন্দিন দিবানিদ্রার পর, যখন তিনি অভ্যাসমত নিত্য-পরিচিত ক্ষুদ্র কৌটাটি খুলিয়া অহিফেন সেবন করিতে যাইবেন, সংবাদ পাইলেন, গৃহিণীর শরীর অসুস্থ—দাইকে খবর দিতে হইবে। কয় দিন হইতে এই অসুস্থতারই তিনি অপেক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। কারণ, সময় পূর্ণ হইয়াই আসিয়াছিল। যাহা হউক, এই সুসংবাদে তাঁহার মনে যুগপৎ হর্ষ, উৎকণ্ঠা ও ভয় আসিয়া দেখা দিল। তাড়াতাড়ি তিনি আজ মাত্রার অধিক অহিফেন সেবন করিয়া ফেলিলেন এবং তৎপরে 'বসুমতী'খানি হাতে লইয়া, খড়মের শব্দে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া, নীচে বসিবার ঘরে আসিয়া বসিলেন। তখন হইতেই তাঁহার এক হাতে গড়গড়ার নল এবং অপর হস্তে 'বসুমতী।' কিন্তু মৌতাতী মনটি তাঁহার এতদুভয়ের কোনটিতেই ছিল না। মন ছিল—অন্দরবাটীর এক পার্শ্বস্থিত ছোট্ট একখানি ঘরের মধ্যে—যেখানে খানিক পরেই হয় ত একটি সদ্যোজাত শিশু কাঁদিয়া উঠিবে—ট্যাঁ—ট্যাঁ—ট্যাঁ।

যাহা হউক, যথাসময়ে তাঁহার কাছে সংবাদ আসিল—একটি ফুট্-ফুটে কন্যা হইয়াছে।

তাহার পর আনন্দে, উল্লাসে, উৎসবে—দিনের পর দিন কাটিতে

লাগিল। এইভাবে সাত মাস কাটিয়া গেলে অষ্টম মাসে কন্যার অন্ন-প্রাশনের দিন আসিল। মহা ধূমধাম। বিশখানা গ্রামে 'সামাজিক' বিলি হইল। তল্লাটের লোককে নিমন্ত্রণ করা হইল। আহূত, অনাহূত, রবাহূত—অসংখ্য লোক ভূরি-ভোজনে পরিতৃপ্ত হইল। দূরদূরান্তর হইতে বহু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এবং অধ্যাপককে 'পত্রী' পাঠান হইয়াছিল; রায় মহাশয় স্বয়ং তাঁহাদের আদর-আপ্যায়ন করিলেন।

বর্দ্ধমান জেলার মোড়লপুর হইতে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক' আসিয়াছিলেন। রায় মহাশয় তাঁহাকে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি কহিলেন,—"জামাইটি ত বছর সাতেক হ'ল মারা গিয়াছে, সে ত আপনি শুনেছেন। তার পর আমার কাছেই বিনুকে এনে রেখেছিলুম। কিন্তু সে-ও আজ বছর দেড়েক হল—"বৃদ্ধ আর বলিতে পারিলেন না, তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় জলে ভরিয়া উঠিল। রায় মহাশয় কহিলেন,—"মেয়েটিও আপনার মারা গিয়েছে? ছেলেবেলা তাকে সঙ্গে ক'রে প্রায়ই এখানে আসতেন, আমার মনে আছে; তখন আমিও ছেলেমানুষ। আহা—মেয়েটি আপনার—"

যে জল বৃদ্ধের চোখে জমা হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা এক্ষণে দুই গণ্ড বাহিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গেই রায় মহাশয়ের মনের নূতন মরস্থানে একটি আট মাসের শিশুকন্যার কচি পদ্মমুখ ফুটিয়া উঠিল। অমনি তিনি দ্রুতপদে অন্দরের উদ্দেশে চলিয়া গেলেন।

—১৩১১ সাল—

"বাব্বা—বাব্‌বা—গোউ।"

শায়িত পিতার বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া একটি দেড় বৎসরের মেয়ে, তাহার ননীর মত কচি হাতখানা মুক্ত জানালার দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল,—"বাব্বা, বাব্বা—গো-উ।"—অর্থাৎ কি না, গরু। পথ দিয়া একটা গরু যাইতেছিল।

"নিনিরাণী!"

"বা-ব্বা!"

"তুমি দুদ্ধ খেয়েছ?"

"গো-উ।"

"হ্যাঁ, গোউ দেখেছি; তুমি দুদ্ধ খেয়েছ?"

"গো-উ—গো-উ—"

"দেখিছি গো, দেখিছি—গরু দেখিছি। নিনিরাণু!"

"বাব্বা, ফু! ফু. ও ফু!"

—অর্থাৎ, জানালার বাহিরে গাছে ফু, তার মানে ফুল দেখিতে পাইয়াছে, তারই একটা চাই।

চাই-ই যখন, তখন ত আর উপায় নাই। রায়মহাশয় হাঁক দিলেন —"হরিদাস!" হরিদাস আসিয়া খুকীর হাতে সেই ফুল আনিয়া দিল

কিন্তু অমনি খুকী সুবিধা পাইয়া পিতার প্রশস্ত বুকখানি অপছন্দ করিয়া হরিদাসের কোলের উপর ঢলিয়া পড়িল। তাহাকে জাপ্টাইয়া ধরিয়া কহিল, "মা—মা—হাম।"

রায় মহাশয় কহিলেন,—"ক্ষিধে পেয়েছে বোধ হয়; নিয়ে যা।"

খুকী হরিদাসের কোলে উঠিয়া, তাহার মুখে হাত বুলাইয়া, পুনরায় তাগিদ দিয়া বলিল,—"মা—মা—মা—ফু হাম।" মানেটা এইরূপ সম্ভব—শীগগীর মার কাছে নিয়ে চল, ফুলটা তাকে দিয়ে, হাম করবো—অর্থাৎ দুধ খাবো।

শিশুকন্যাটি সংসারে আসা অবধি রায় মহাশয়ের গৃহে আনন্দের অমৃতধারা প্রবাহিত হইয়াছে। সে ধারায় বহু দিনের শুষ্ক ক্ষেত্র কোমল শ্যামল, নব দূর্ব্বাদলে ভরিয়া উঠিয়াছে। তথাকার মৃতপ্রায় তরুরাজী আজ নবীন পল্লবে মুঞ্জরিত। সেখানে আজ সুগন্ধের ভাণ্ডার বুকে পুরিয়া গুচ্ছে গুচ্ছে কুসুমরাজী ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কর্ত্তা গৃহিণী আদর করিয়া কন্যাকে ডাকেন—নিনি।

ভাল নাম – মন্দাকিনী।

মন্দা—অমরার অমর বাঞ্ছিত অমৃতের ধারা।

(৬)

—১৩২৪ সাল—

মন্দাকিনী এখন আর শিশু নহে। এখন সে পঞ্চদশী কিশোরী। বছর পাঁচ সাত হইতে সে এক অদ্ভুত গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে বলে, পূর্ব্বজন্মে বর্দ্ধমান জেলার মোড়লপুরে সে জন্মিয়াছিল। পলাশদীঘিতে তাহার বিবাহ হয়। বাইশ বৎসর হইল, তাহার স্বামী অন্য কোন স্থানে আবার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাহার পূর্ব্বজন্মের পিতাও এখন আর জীবিত নাই। এই ধরণের নানা কথা সে পিতামাতা এবং বড় পিসীর কাছে বলিয়া আসিতেছে।

প্রথম প্রথম রায় মহাশয় কথাগুলাকে তেমন গুরুভাবে লয়েন নাই। কিন্তু পরে আর উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। নিনির প্রবল আগ্রহে ও-বছর তাহাকে লইয়া রায় মহাশয়কে বর্দ্ধমান জেলার মোড়লপুর গ্রামে ৺মহানন্দ মুখুয্যের গৃহে যাইতে হইয়াছিল। একটিবার হুগলী জেলার পলাশদীঘিতেও যাইতে হইয়াছিল। বিমলের পৈতৃক সেই ভাঙ্গা বাড়ীর উঠানমধ্যস্থ সেই আমগাছতলায় বসিয়া মন্দাকিনীর সে কি আকুল ক্রন্দন! অনেক কষ্টে, অনেক চেষ্টায় তিনি কন্যাকে শান্ত করিতে সমর্থ হয়েন। সে ভগ্নগৃহ-স্তূপের উপর হইতে মন্দা কি ফিরিয়া আসিতে চাহে!

নিনি বিবাহের বয়সে আসিয়া পড়িলেও, দু'একটি কারণে আজ পর্য্যন্ত তাহার বিবাহ দেওয়া ঘটিয়া উঠে নাই। এক কারণ—রায় মহাশয়

অতুল বিভবের মালিক এবং নিনি তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী কন্যা! কোন সম-অবস্থাপন্ন ধনিপুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিলেই তাঁহার নয়নের মণিকে নয়নের আড়াল করিতে হইবে। সেটা কি তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে? কোন দরিদ্র ঘরের ছেলের সহিতও তিনি নিনর বিবাহ দিয়া, জামাতাটিকে ঘরেই রাখিতে পারেন, কিন্তু সেরূপ পছন্দমত ছেলে অনেক খোঁজাখুঁজিতেও মিলিতেছে না। তার পর আর একটি বড় কারণ আছে। নিনি যাহার কাছে কিছুমাত্র লজ্জা করে না এবং যাহার কাছে তাহার মনের সকল কথাই অসংকোচে খুলিয়া বলে, তাহার সেই বড় পিসীর কাছে সে বলে যে, তার পূর্ব্বজন্মের স্বামীর সঙ্গেই তাঁহার বিবাহ হইবে। তাঁহাকে ছাড়া সে আর কাহাকেও বিবাহ করিতে পারিবে না। তাহার সেই বাঞ্ছিত স্বামীকে সে দেখিলেই চিনিতে পারিবে। এ জন্মে কোথায় তিনি জন্মিয়াছেন, তাহা সে জানে না। কিন্তু তাঁহার সহিতই যে তাহার বিবাহ হইবে, তাহাতে আর কোন ভুল নাই। এ কথা সে ঠিকই জানে, কিন্তু কেমন করিয়া জানে, তাহা সে কিছুই বলিতে পারিবে না।

এই সব কথা, রায় মহাশয় সাধ্যমত গোপন রাখিতেই চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন, বাহিরে বড় একটা কেহ জানিতে পারে নাই।

গৃহিণী বলেন—"দেখ, নিনিও যেমন পাগল মেয়ে, তুমি আর ঠাকুরঝিও তেমনি পাগল হয়েছ! একজন ভাল ডাক্তার দিয়ে ওকে একবার দেখাও দিকি। আমার বোধ হয়, এ-সব ওর মনের কোন রকম অসুখ ছাড়া আর কিছুই নয়।"

গৃহিণীর কথানুযায়ীই কায হইল। রায় মহাশয় নিনিকে লইয়া শীঘ্রই কলিকাতা আসিলেন এবং ভাল একজন ডাক্তারকে দিয়া নিনিকে

দেখাইলেন। ডাক্তার পরামর্শ দিলেন—"কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে দিনকতক দেশভ্রমণ করিয়ে আনুন। নানা দেশের নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঘুরে এলে এ-রকম ভাবটা সেরে যাবে।"

সেই ব্যবস্থাই হইল। রায় মশায় ৺দুর্গাপূজার পরই কন্যা ও তাঁহার জ্যেষ্ঠা সহোদরাকে লইয়া দেশ-ভ্রমণে বাহির হইলেন। মধুপুর, গিরিডি, গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, আগ্রা, দিল্লী প্রভৃতি পশ্চিমের নানা স্থান ভ্রমণ করিলেন। ইহার ফলে সকলের স্বাস্থ্যের প্রভূত উন্নতি হইল বটে কিন্তু নিনিরাণীর মনের কোন পরিবর্ত্তন ঘটিল না, তাহার সেই একই কথা— 'তাহার পূর্ব্বজন্মের স্বামীর সহিতই তাহার বিবাহ হইবে।'

পৌষের শেষে, গৃহে ফিরিবার পথে রায় মহাশয় আর একবার কাশী আসিলেন। এখান হইতে বরাবর দেশে ফিরিবেন, আর কোথাও দেরী করিবেন না। তিন মাস হইল তাঁহারা বাটীছাড়া, সুতরাং ফিরিবার জন্য সকলেরই মন অস্থির হইয়াছে।

এক দিন সকালে তিনি একলা বাহির হইয়া বিশ্বেশ্বরের গলি হইতে কতকগুলি জারমান-সিলভারের বাসন কিনিলেন। যে পরিমাণ মূল্যের বাসন কিনিবেন বলিয়া তাঁহার মনে ছিল, এটা-সেটা কিনিতে কিনিতে সে-মূল্য ছাপাইয়া গেল, সুতরাং তিনি যে-টাকা লইয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে কুলাইল না, কিছু টাকা কম পড়িল। দোকানী এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক। তিনি কহিলেন—"একটি ছেলেকে আপনার সঙ্গে দিচ্ছি, বাকী দামটা তার হাতে দিয়ে দেবেন।"

পুষ্পদন্তেশ্বরে রায় মহাশয়ের বাসা। তিনি ছেলেটিকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন। তাহাকে নীচে সিঁড়ির কাছে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া তিনি

উপরে টাকা আনিতে গেলেন। সেই সময় নিনি এ-দিককার ঘরে ছিল, সে জানালার ফাঁক দিয়া একদৃষ্টে ছেলেটির দিকে দেখিতে লাগিল। তার পর টাকা লইয়া, সেই ঘরের মধ্য দিয়া আসিতে গিয়া রায় মহাশয় দেখিলেন, নিনি জানালার ধারে মেঝের উপর অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে। তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। চীৎকার করিয়া বড় ভগ্নীকে তিনি ডাকিলেন। দয়াময়ী ছুটিয়া আসিলেন। হরিদাস ও বামার মা ঝি পাখা ও জল লইয়া ছুটিয়া আসিল। নীচে হইতে সেই ছেলেটিও আসিল। সকলের চেষ্টায় ও সেবায় মিনিট আট-দশের মধ্যেই নিনির জ্ঞান ফিরিয়া আসিল।

একটু সুস্থ হইলে সে বড়পিসীকে কহিল—"আমার পূর্ব্বজন্মের সেই স্বামী, বড় পিসী।" দয়াময়ী কহিলেন,—"কি বাজে কথা সব বলিস—বল্ ত ?"

ঠিক্ বড় পিসী—ঠিকই। যা বলছি, এর এক বিন্দুও বাজে কথা নয়। ইনিই সেই। তোমরা জাতিস্মর জাতিস্মর বোলে আমার মাথা খারাপ ক'রে দাও খালি। জাতিস্মর হ'লে, পূর্ব্বজন্মের সব কথাই না হয় মনে থাকবে। ইনি ত নতুন জন্ম নিয়েছেন, এখন এঁকে আমি চিনতে পারলুম কি ক'রে ?" জাতিস্মর ছাড়া এতে এমন কিছু আছে, যা আমি তোমাদের কাছে ঠিক ক'রে বলতে পাচ্ছি না।" বলিতে বলিতে নিনির চোখ জলে ভরিয়া আসিল।

দয়াময়ীর মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া, রায় মহাশয় তখনই সেই বাসনের দোকানের উদ্দেশে বহির্গত হইলেন। সেখানে গিয়া ছেলেটির সম্বন্ধে খোঁজ লইয়া যাহা জানিতে পারিলেন, তাহা এই :—

—চৌ-চৌ—

ছেলেটির নাম দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়। বয়স বছর বাইশ কি তেইশ। দোকানী বাবুটিরই এক বন্ধুপুত্র। গত বৎসর ছেলেটি বি এ পাশ করিয়াছে। এখানে তাহার বৃদ্ধা ঠাকুরমা কাশীবাস করিয়া আছেন। তাই তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে দেখিতে আসিতে হয়। এদের দেশ—কলিকাতার দক্ষিণ রাজপুর গ্রামে। দেশেই বাপ-মা আছেন। সাংসারিক অবস্থা খুব ভালও নয়, খুব মন্দও নয়—মাঝামাঝি। দেবব্রত সর্ব্ববিষয়েই খুব সৎ এবং নূতন বিজাতীয় ভাবধারার বিষস্রোতে নিজেকে ভাসাইয়া না দিয়া জাতীয় ধর্ম্ম, আচার-ব্যবহার এবং বৈশিষ্ট্যকে সব দিক দিয়াই মানিয়া এবং রক্ষা করিয়াই চলে। এখনও তাহার বিবাহ হয় নাই ; খোঁজাখুঁজি, দেখা-শুনা, কথা-বার্ত্তা চলিতেছে।

রায় মহাশয় কাশীতে আর বিলম্ব করিলেন না। সকলকে লইয়া দুই এক দিনের মধ্যেই তিনি দেশে ফিরিলেন। দেশে গিয়াই তাঁহাকে একবার রাজপুর গ্রামে যাইতে হইল।

(৭

—১৩২৫ সাল—

গত ফাল্গুনের এক শুভদিনে দেবব্রতের সহিত মন্দাকিনীর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এ বিবাহে সকলেই সুখী হইয়াছে। গ্রামের সকলেই বলিতেছে—যেমন দেবীর মত মেয়ে, তেমনি দেবতার মত জামাই হইয়াছে। মন্দার এত দিনের রিক্ত হৃদয় যেন অমূল্য মণিমাণিক্যে ভরিয়া গিয়াছে। দয়াময়ী মন্দাকে কাছে টানিয়া, তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া বলেন—"সম্পর্কের হিসেবে বলা চলে না বটে কিন্তু আমার কাছে তুই ত কিছুই কখনও লুকোস নি, তাই আমিও বলি, নিনি, তোর ভালবাসা বটে! এত তার জোর যে, জন্মান্তরের স্বামীকে তুই অধিকার ক'রে তবে ছাড়লি!"

নিনি হাসিতে হাসিতে বলে—"বড় পিসী, সম্বন্ধটা যে তাই গো। জন্ম-জন্মই যে আমি ওঁর দাসী।"

বিবাহের পর গোটা চৈত্র মাসটা স্বামীর সহিত নিনির রাজপুরে কাটিয়াছে। সেখান হইতে বৈশাখ মাসে সে ভাণ্ডারহাটী আসিয়াছে। সম্মুখেই জামাই-ষষ্ঠী। দেবব্রতকে আনিবার জন্য লোক পাঠানো হইয়াছে।

বিবাহের পর এই প্রথম জামাই-ষষ্ঠী, সুতরাং রায় বাড়ীতে আনন্দের ও উৎসবের স্রোত বহিতে লাগিল।

সন্ধ্যার সময় দ্বিতলের নির্জ্জন প্রশস্ত কক্ষমধ্যে রায় মহাশয় কন্যা-

জামাতাকে লইয়া নানারূপ গল্প-গাছা করিবার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন,—"সন্ধ্যাহ্নিকটা সেরে নিই গে। বেজায় গুমোট করেছে আজ। এই বারান্দাটি আমার এমন যে, কোথাও হাওয়া না থাকলে এখানে একটু থাকবেই। তোমরা এইখানেই থাক।" যাইতে যাইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কন্যা-জামাতার মুখের দিকে চাহিয়া আবার কহিলেন,—"আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। দিনও ফুরিয়েছে, কাযও ফুরিয়েছে। এইবার থেকে সকল ভার তোমাদের দু'টির ওপরেই পড়বে আর কি।"

সে দিন সন্ধ্যার কিছু পরেই চতুর্দ্দিক তরল জ্যোৎস্নায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। সারাদিনের অসহ্য গুমোটের পর ঝির্‌-ঝির্‌ করিয়া স্নিগ্ধ বায়ু বহিতে সুরু হইল। কৃষ্ণা দ্বিতীয়ার চাঁদের আলো সারা বারান্দা ও ছাদের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। দেবব্রত কহিল,—"কি সব তুমি বল, মন্দা, আমি কিছুই বুঝতে পারি না। তবে এইটুকু বুঝি, তোমায় দেখে অবধি মনে হয় যে, বহুদিনের কি একটা হারিয়ে যাওয়া জিনিষ—না, না মন্দা—আমি ঠিক ক'রে কিছু বুঝতেও পাচ্ছি না, বুঝিয়ে বলতেও পাচ্ছি না, যেন—যেন—মনের মধ্যেকার বহুদিনের একটা ফাঁক কাণায় কাণায় সহসা ভ'রে উঠেছে। কিন্তু তোমার সব কথা আমি ঠিক ধরতে বা বুঝতে পাচ্ছি না।"

উচ্ছ্বসিত পুলকে মন্দা কহিল,—"তোমার কিছু আর বুঝতে হবে না।" তাহার অগুরুবাসিত কুঞ্চিত অলকাবলী দেবব্রতের স্কন্ধে, পৃষ্ঠদেশে, বক্ষে লুটাইয়া পড়িয়াছিল। ছোট্ট মাথাটি স্বামীর বক্ষে রাখিয়া অসীম তৃপ্তিতে মন্দা কহিল,—"একবার লুকোচুরি খেলবে? আমগাছকে বুড়ী ক'রে? বল না—খেলবে একবারটি?"

"মন্দা!"

দেবব্রতের পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া মন্দা তাঁহার কাণের কাছে মুখ আনিয়া চুপি চুপি কহিল,—"মন্দা নয়—বড় সাধ হচ্ছে, একবার বিন্দু ব'লে ডাক। ডাকবে?"

জয়-যাত্রা

১

"পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল,
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল।

সকালবেলা খিড়কীর পুকুরঘাটে মুখ ধুইতে ধুইতে তিনকড়ি মাথা উঁচু করিয়া সম্মুখের দিকে চাহিতেই দেখিতে পাইল, ওপারে ভট্টাচার্য্যদের বৈঠকখানা-ঘরের জানালার ধারে দাসু ভট্টাচার্য্য তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। চারি চক্ষুর মিলন হওয়ামাত্র দাসু উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করিয়া যাইতে লাগিল——

"রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে,
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে

এই সুপরিচিত চারি ছত্র কবিতা ছিল তিনকড়িকে গোপনে ডাকিবার দাসুর চিরকালের ইঙ্গিত।

গোপনে ডাকার একটু কারণ আছে। ভট্টাচার্য্যদের এই বৈঠকখানাটির প্রতি গ্রামের সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা ছিল না। স্বর্গগত কর্তাদের আমলে গাঁয়ের লোকের পুঞ্জীভূত শ্রদ্ধা, যাহা এই ঘরে বহু বৎসর ধরিয়া জমিয়া উঠিয়াছিল, বর্ত্তমান আমলে তাঁহাদের একমাত্র বংশধর দাসু

ভট্টচাযের প্রতিষ্ঠিত থিয়েটারের আড্ডা এবং তৎসংক্রান্ত নাচ-গান, বক্তৃতা, লাফালাফি, দাপাদাপির চোটে নাকি সে সমস্ত, নিঃশেষে উড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু দাসু ভট্টাচার্য্যের আড্ডার প্রতি কাহারও শ্রদ্ধা না থাকিলেও, ঘৃণা ছিল না। কারণ, বারোয়ারী চাঁদা তোলা, মড়া পোড়ান মড়কের সময় সঙ্কীর্ত্তন ও রক্ষাকালীপূজার আয়োজন, চুরি-ডাকাতির ভয়ের সময় রাত জাগিয়া লাঠি হাতে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়ান প্রভৃতি কার্য্য এই আড্ডা হইতেই হইত।

সে দিন একটু বেলাতেই তিনকড়ির নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। তার পর প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া যখন সে খিড়কীর ঘাটে মুখ ধুইতেছিল, তখন শরতের সূর্য্য আকাশের কোণ হইতে ঝলকে ঝলকে সোনালী রৌদ্র চারিদিকে ছড়াইয়া ফেলিতেছিল। রাখালের গরুর পাল সে সময় মাঠে বাহির হইবার সময় না হইলেও, দাসু ভট্টাচার্য্যের থিয়েটারের আড্ডায় তখন শিশুগণ নিজ নিজ পাঠে মনোনিবেশ করিয়াছিল, অর্থাৎ নূতন পালা 'হরিশ্চন্দ্র' সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা এবং তর্ক-বিতর্ক চলিতেছিল।

গাড়ুতে এক গাড়ু জল ভরিয়া, তাহা হাতে লইয়াই, বাঁহাতে কাণে জড়ান পৈতা খুলিতে খুলিতে তিনকড়ি পুকুরের পাড় ধরিয়া দাসুর বৈঠকখানাঘরে ঢুকিতেই দাসু কহিল, "এই জন্যেই, দাদা, দু'-দুটো বিয়ে করলুম; কিন্তু বড়লোকের ঘরের মেয়ে ঘরে আনিনি। বৌদি যদ্দিন বাপের বাড়ী ছিল, তদ্দিন তুমি বেশ ছিলে, দাদা! তখন তোমার তবু তিন কড়া দাম ছিল, এখন দেখছি, তোমার দাম এক কড়াও নেই।"

তিনকড়ি বাহিরে গাড়ু রাখিয়া ভিতরে গিয়া বসিল।

এইখানে একটুখানি টীকার হয় ত প্রয়োজন আছে।

তিনকড়ির পূর্ব্বপুরুষগণ কবে কোন্ যুগে না কি এই গ্রামেরই মালিক ছিল। তাহার পর কবে না কি রাজার খাজনা সময়ে দিতে না পারায় গ্রামের জমীদারী হস্তান্তরে যাইয়া পড়ে। তাহার পর, কয়েক হাত ঘুরিয়া, আজ বিশ বৎসর হইল, তাহা পাশের গ্রামের মিত্রদের হাতে আসিয়াছে। মিত্রদের ধর্ম্মভয় ও বিবেচনাশক্তি দুই-ই খুব প্রবল ছিল। তাই তাঁহারা তাঁহাদের জমীদারীর আদি মালিকের দরিদ্র বংশধরকে নিজেদের সেরেস্তায় দশ টাকা বেতনের একটি কাজ দিয়া ধর্ম্মরক্ষা ও সুবিবেচনার পরিচয় দিয়াছিলেন।

তিনকড়ির বংশগৌরব ছিল অক্ষুণ্ণ। কৌলীন্যে সে ছিল অনেক ঊর্দ্ধে তাহার বংশপরিচয়ের পতাকা সমাজ-শীর্ষে সগৌরবেই উড়িত। বহু দূর হইতে বহু ঊর্দ্ধের এইপতাকা দেখিতে পাইয়া ধনিগৃহ হইতেই কন্যাদানের আহ্বান তাহার কাছে আসিয়াছিল এবং তিনকড়ি এ দানের আহ্বান প্রত্যাখ্যানও করিতে পারে নাই।

কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। বিবাহই হইয়াছিল কিন্তু স্বর্ণকে কখনই স্বামীর ঘর করিতে হয় নাই। অবশেষে কি ভাবিয়া ধনী শ্বশুর আজ বৎসর দুই হইল, কন্যাকে জামাতার ঘর করিতে পাঠাইয়াছেন। কিন্তু এই দুই বৎসরের মধ্যে তিনবার স্বর্ণ বাপের বাড়ী ঘুরিয়া আসিয়াছে।

দাসু কি একখানা বইয়ের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে নিজের মনেই কহিল, "মেয়েমানুষকে অত ভয় ক'রে চলতে হবে! মেয়েমানুষ থাকবে পায়ের তলায়।"

বৈঠকে আরও দুই চারি জন ছিল। সকলেই এ কথায় সায় দিল, দিল না শুধু ক্ষিতীশ। সে গ্রামে থাকে না। কলিকাতায় থাকিয়া কি একটা

করে। খবরের কাগজ, মাসিকপত্র পড়ে। ইংরাজী নভেল লইয়াও নাড়া-চাড়া করে। প্রত্যহ প্রাতে লাল কালীতে নিয়মিত দুর্গানামও লেখে, এবং মুর্গীর ডিমের হলুদে অংশটাও খায়। সম্প্রতি সে বাটী আসিয়াছে।

নারীজাতির স্থাননির্দ্দেশ সম্বন্ধে দাসুর অভিমতের উত্তরে ক্ষিতীশ কহিল, "পায়ের তলায় থাকে ত মাটী। মাটী সরিয়ে সেখানে মেয়েমানুষের স্থান করতে হ'লে পৃথিবীকে রসাতলে দিতে হয়।"

অর্থটা সঠিকভাবে না বুঝিলেও দাসু তাহার বড় বড় গোল চক্ষু তাহার দিকে ফিরাইয়া কহিল, "রসাতলেই যাচ্ছে, তার বড় আর দেরী নেই।"

ক্ষিতীশ কহিল, "গেলেই ভাল হ'ত বটে, কিন্তু তা আর হ'ল কৈ? যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। এখনকার পুরুষদেরও বয়স পাঁচ বছর ছাড়িয়েছে, মেয়েদেরও বয়স একুশদিন পেরিয়ে গেছে।

সকলেই অবাক্ হইয়া ক্ষিতীশের মুখের দিকে চাহিল। দাসু কিছুই বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"এ কথার অর্থ?"

"অর্থাৎ, বেটাছেলেদের এখন জ্ঞান হয়েছে, আর মেয়েদেরও এখন চোখ ফুটেছে, এই আর কি? সুতরাং স্ত্রীলোকের ওপর পুরুষের অত্যাচারের দিন শেষ হয়ে আসাতে মা ধরিত্রী রসাতলের পথ থেকে ঘুরেই দাঁড়িয়েছেন।"

"তোমার মতে কি মেয়েদের মাথায় ক'রে রাখতে হবে?"

"তা হ'লে ত ঘাড় ভেঙ্গে যাবে। তা ব'লে যে ভাবে তাদের দাসী বাঁদীর মতন পায়ের তলায় ফেলে রাখা হয়েছে, তাতে জাতি জাহান্নমেই

যেতে বসেছে কি না! সুতরাং মাথায়ও নয়, পায়ের তলাতেও নয় আমি চাই পাশে রেখে চলতে।"

অল্পক্ষণ মধ্যেই তর্ক প্রবলাকার ধারণ করিল। ইওরোপ আসিল, আমেরিকা আসিল, জাপান আসিল। কে একজন নবীন তুরস্কের কথা উল্লেখ করিল। একজন পুরাণ উপনিষদ আনিয়া ফেলিল; একজন সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের আদর্শ সমাজ প্রথার বিশদ বর্ণন করিল।

কিন্তু যে লোকটা সমস্তক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল, একটা 'হাঁ' ও করিল না, একটা 'না'ও করিল না, সে তিনকড়ি। তিনকড়ি ছিল সেই ধরণের মানুষ, যে, তাহার পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে দ্বিতীয়টারই বেশী ব্যবহার করে, চতুর্থটির বড় একটা করে না। সর্ব্বত্র সকল সময়েই সে নীরব: এমন কি, অত্যাচার অবিচার পর্য্যন্ত সে মাথা পাতিয়া গ্রহণই করে, কখনও অভিসম্পাত দান করে না।

তর্কের স্রোত একটু কমিয়া আসিলে তিনকড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল এবং গাড়ুটি তুলিয়া লইয়া খিড়কীর পথের পরিবর্ত্তে সদর দিয়া আসিবার অভিপ্রায়ে ও-দিক দিয়া ঘুরিয়া গেল।

পথের বাঁক ঘুরিতেই শুনিল, নন্দীদের চণ্ডীমণ্ডপে দুই চারি জন বসিয়া গীতবাদ্য করিতেছে। মিনিট দুই চারি কানাচের আড়ালে দাঁড়াইয়া শুনিবার পর তিনকড়ি ভিতরে আসিল এবং হাবুল নন্দীর কোলের উপর হইতে বাঁয়াটি তুলিয়া লইয়া কহিল, "কারফায় মিলবে কেন রে, চিমে-তেতালার দরকার।"

অতঃপর অসীম উৎসাহে গানের পর গান শেষ ও সুরু হইতে লাগিল এবং চিমে তেতলায় বউদি হইয়া তিনকড়ির নিপুণ হাত হইতে সঙ্গীত-

বিদ্যান্তর্গত সর্ব্বপ্রকারের সব কয়টি তালের অপূর্ব্ব কসরৎ চলিতে লাগিল। গাঁয়ের মধ্যে এই বিদ্যাটিতে তাহার সমকক্ষ আর কেহই ছিল না। সুতরাং দেখিতে দেখিতে এক জন এক জন করিয়া ভীড় জমিয়া উঠিল, উঠানের রৌদ্র চণ্ডীমণ্ডপের পৈঠার ছায়াকে সরাইয়া দিয়া তাহার স্থানাধিকার করিল এবং তিনকড়ির গাড়ুর শীতল জলটুকু রৌদ্রতাপে গরম হইয়া উঠিল।

(২)

অনেক বেলায় গাড়ু হাতে করিয়া যখন তিনকড়ি গৃহে ফিরিল, তখন স্বর্ণ স্নানাহার শেষ করিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িয়া নিদ্রার চেষ্টা করিতেছিল। কহিল, "সকাল সকাল মুখ-হাত ধুয়ে এলে! তা বেশ! কিন্তু এখন আর আমি উঠে ভাত-টাত দিতে পারবো না। ঢাকা-ঢুকি আছে, দেখে শুনে নিয়ে খাও গে।" স্বর্ণ পাশ ফিরিয়া শুইল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে তিনকড়ি নদী হইতে স্নান এবং নদীর ঘাট হইতে সন্ধ্যাহ্নিক সারিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইয়া দেখিল, রান্নাঘরের উনুনে আগুন পড়িয়াছে এবং অসীম উৎসাহে স্বর্ণ রন্ধনাদির কার্যে মনোযোগ দিয়াছে। কাপড় ছাড়িয়া বাহিরে আসিতেই স্বর্ণ কহিল, "মথুর এসেছে। বাবা পুজোর কাপড়-চোপড় পাঠিয়েছেন।"

মথুর স্বর্ণর বাপের বাড়ীর ভৃত্য।

তিনকড়ি কহিল, "তা হ'লে——"

"হ্যাঁ, দোকান থেকে কিছু জলখাবার আগে এনে দাও, তাকে নাইতে পাঠিয়েছি। তার পর, একবার জেলে-বাড়ীতেও যেতে হবে,—বুঝলে ?"

তিনকড়ি সম্মতি-সূচক ঘাড় নাড়িয়া জলখাবার আনিতে চলিয়া গেল। ফিরিয়া আসিলে স্বর্ণ কহিল, "রান্না-বান্না হলে তুমিও না হয় খেয়ো এখন। ও ভাত কি তুমি খেতে পারবে ? দেখি, বেরালে ঢাকা উল্টে ফেলে সব নষ্ট করেছে।"

"মধুর না এসে পড়লে তাই ত খেতে হ'ত! সুতরাং পারবো এখন।"

স্বর্ণ মুখে এ কথার কোন উত্তর দিল না বটে, কিন্তু খানিকক্ষণ ধরিয়া তিনকড়ির মুখের উপর এমন এক প্রকার দৃষ্টি স্থির করিয়া চাহিয়া রহিল যে, তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া অপরাধীর মত তিনকড়ি এক পা এক পা করিয়া সেখান হইতে সরিয়া গেল।

পরদিন সকালবেলা স্বর্ণ একখানি দেশী মিলের ধোয়া ধুতি তিনকড়ির দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া কহিল, "বাবা দিয়েছেন।"

ধনী পিতা কন্যাকে চারি রকমের চারিখানি দামী শাড়ী, দুইটি ব্লাউজ, দুইটি সেমিজ, সাবান, আলতা, সেন্ট, স্নো প্রভৃতি অনেক কিছুই পাঠাইয়াছিলেন। অন্য দিকের ত্রুটী মাতা পূরণ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ মধুরের হাতে পঁচিশটি টাকা দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, "লুকিয়ে দিও, জামাই যেন না জানতে পারে।"

সন্ধ্যার পর স্বর্ণ স্বামীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "এ বেলা দুটি মুড়ি-টুড়ি যা হয় কিছু খেয়ো, আমি আর রান্না করতে পারবো না।"

"তাই খাবো, কিন্তু তুমি?"

"আমি আর ও শুক্‌নো মুড়ি চিবুতে পারব না। না খেয়েই থাকবো। সমস্ত দিন হাঁড়ি ঠেলে আর আমি রান্নাঘরে যেতে পারব না। বাইশ বছর বয়স পর্য্যন্ত কখনো ত এ কাজ কর্‌তে হয় নি—এমনি লক্ষ্মী ছাড়া ঘরে পড়েছিলুম যে———,বাস্তবিক, এক এক সময় ভাবি যে, গরীবরা বিয়ে করে কেন? তারা নিজেরা হয় ত বেশ থাকে, কিন্তু যাদের ঘরে আনে, তাদের কি কষ্টই না তারা দেয়! যজ্ঞ-পুজোয় আর আমাকে

তোমার কাপড়-চোপড় কিছু দিতে হবে না। সত্যি, কোথায়ই বা পাবে? দু'টি পেটের ভাতেরই তোমার যোগাড় নেই।" বিদ্রূপের একটা হাসির তরঙ্গ স্বর্ণর অধরতটে সশব্দে প্রহত হইল।

(৩)

এবার এ গ্রামে বারোয়ারীর দুর্গোৎসবে তেমন সাড়া নাই। দুলেপাড়া দাইপাড়াতে কলেরা দেখা দিয়াছে। শুধু দেখা দেওয়া নহে—দেখা দেওয়ার রূপটা ভীষণ। প্রত্যহই নদীর ধারে দুই এক জনের শ্মশানোৎসব সম্পন্ন হইতেছে।

অতি প্রত্যূষে তিনকড়ি ওপাড়ার কার্ত্তিক দুলের সদরের আগড় খুলিয়া বাহির হইল। গত রাত্রিতে কার্ত্তিক দুলে মারা গিয়াছে।

তখন সূর্য্যোদয়ের বিলম্ব ছিল। মাঠের ঘাসের উপর রাতের শিশির অল্প অল্প পড়িয়াছিল। আসন্ন পূজার আভাস দান করিয়া শরতের স্নিগ্ধ প্রভাতবায়ু নদীতীরের দীঘ তৃণগুচ্ছকে ঈষদান্দোলিত করিতেছিল। এ পাড়ার আউশ-ক্ষেত কয়খানির জল শুকাইয়া গিয়া ধান সব পাকিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু পাড়ার লোক মহামারীতে বিব্রত, ধান কাটিয়া ঘরে আনিতে আর কেহ অবসর পায় নাই।

কয়েকখানি আউশ-ভূঁই অতিক্রম করিয়া, ধাড়াদের অড়হরের বেড়া-ঘেরা বেগুনবাড়ীর পাশ দিয়া আসিয়া তিনকড়ি ও-পাড়ার হরিসভার শিউলীতলায় আসিয়া একবার দাঁড়াইল। টুপ-টাপ করিয়া তখনও একটি একটি শিউলী ফুল ঝরিয়া পড়িতেছিল। এ কয় দিন এ পাড়ায় ফুল কুড়াইবার আর কেহ ছিল না, তাই গাছের তলায় কয় দিনের ফুল স্তূপীকৃত হইয়া জমিয়া নষ্ট হইতেছিল।

সম্মুখের একখানা দোচালার ঘুলঘুলি হইতে মুখ বাড়াইয়া কে এক জন বলিয়া উঠিল,—"দা'ঠাকুর, ছেলেটার কি খবর ?"

তিনকড়ি শুধু মাথাটা নাড়িয়া, খবর যে ভাল নয়, তাহাই জানাইল এবং ডানদিকে কাল-কাসুন্দে, ঝাঁটি, বন-নীলের জঙ্গলের মধ্য দিয়া যে ফালি পথটা তাহার গৃহের দিকে গিয়াছে, তাহাই অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইল।

গৃহের প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইতেই স্বর্ণ ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কহিল. "তুমি শুধুই গরীব নও—খুব ছোট লোক ! আশ্চর্য্য !"

তিনকড়ি কোন কথাই কহিল না, আর অগ্রসরও হইল না, সেইখানেই নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

স্বর্ণ কহিতে লাগিল, "তুমি অত্যন্ত নির্লজ্জ, অত্যন্ত নির্দ্দিণ্যে, অত্যন্ত যাচ্ছেতাই ! কা'ল সন্ধ্যের সময় বেরিয়ে গিয়েছিলে, সারারাত কাটিয়ে আজ এখন বাড়ী ঢুকলে। একটা গরীবের মেয়ে ঘরে আনোনি যে, যা ইচ্ছে তাই করবে। কার হেফাজতে একলা যুবতী বৌকে রেখে গিয়েছিলে শুনি ? এমন অভদ্র, ইতর বংশে জন্ম তোমার !"

"কার্ত্তিক দুলেটা কা'ল মারা গেল———"

"বয়ে গেল ! হাড়ি বাগ্দী, দুলে ম'ল ত আমার কি ? তুমিও ঐ সঙ্গে——কিন্তু খবরদার ঘরে ঢুকে সব ছোঁয়াছুঁয়ি কোরো না। শেষকালে বাইরের বিষ ঘরে এনে আমাকেও যে বিঘোরে মারবে, তা আমি কিছুতেই হোতে দেবো না।"

"ঘরে আর তা হ'লে ঢুকবো না ! আমি বাইরে ঐ গোয়ালের পাশের ছোট চালাখানাতেই না হয় থাকবো," বলিয়া ধীরপদে সেই দিকে তিনকড়ি চলিয়া যাইতেছিল, স্বর্ণর হুঙ্কারে থমকিয়া দাঁড়াইল।

"আজ বাদে কাল পুজো, আমার হার কৈ? সে হার আমার বেচে খেয়েছ না কি? একটা নাকছাবি দেবার ক্ষমতা নেই, কখনও দাওনি, আমার জিনিষ নিতে একটু লজ্জা হয় না? হার আমার এক্ষুনি এনে দাও, নইলে আমি কুরুক্ষেত্তর কাণ্ড বাধাব।"

ও-বৎসর আষাঢ়মাসে স্বর্ণ যখন এখানে আসে, তার কিছুদিন পরেই অসুখে পড়ে। তিনকড়ি অক্লান্ত শুশ্রূষা ও অর্থব্যয় করিয়া তাহাকে আরোগ্য করিয়া তোলে, কিন্তু অনেকগুলি টাকা এ জন্য তাহার দেনা হয়। যাহার কাছে দেনা হইয়াছিল, সে শুধু হাতে টাকাগুলি ফেলিয়া রাখিতে অনিচ্ছুক হয় ও তিনকড়িকে তাগাদার পর তাগাদা করিয়া অতিষ্ঠ করিয়া তোলে। অনন্যোপায় হইয়া তিনকড়ি স্ত্রীর হারছড়াটি তাহার কাছে বন্ধকস্বরূপ রাখিয়া তাগাদার দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। স্বর্ণকে বলিয়াছিল যে, এক মাস পরে সে তাহার হার খালাস করিয়া দিবে। কিন্তু ব্যাপার ঘটিয়া গেল অন্য রকম। এক মাস পরে দেনার টাকা পরিশোধ করিয়া হার খালাস করিয়া আনার পরিবর্তে, তিনকড়ি উহার উপর আরও কিছু টাকা আনিল। কিছুদিন পরে আরও কিছু আনিল এবং কিছুদিন পরে আরও। অর্থাৎ স্বর্ণ সংসারে আসার পর হইতে তাহার যৎসামান্য আয়ে স্বর্ণর পছন্দমত ব্যয় কিছুতেই কুলাইত না। সুতরাং দুই দশ টাকা করিয়া যখন যাহাই দরকার পড়িত, তিনকড়ি স্ত্রীর অগোচরে ঐ হারের উপরই তাহা লইয়া আসিত। ফলে এই হইল যে, সুদে এবং আসলে এক হইয়া যখন হারের মূল্যের সমান হইয়া আসিল, তখন গোপনে এক দিন উহা বিক্রয় করিয়া তিনকড়িকে পাওনাদারের দেনা শোধ করিতে হইল। স্বর্ণ এ সকলের কিছুই জানিত না। সুতরাং

পাওনাদারের তাগাদা হইতে নিষ্কৃতি পাইলেও স্বর্ণর কড়া তাগাদা তাহাকে মধ্যে মধ্যে যে ব্যথা ও লাঞ্ছনা দিত, তাহা সে বরাবরই সহ্য করিয়া আসিতেছে।

বারবাড়ীর গোয়ালের পাশের ছোট চালাটির ভিতর কয়দিনের পরিশ্রম ও জাগরণক্লান্ত শরীর, মলিন শয্যায় লুটাইয়া দিয়া তিনকড়ি তাহার বর্ত্তমানের এ মহাদায় উদ্ধারের কথাই একাগ্রমনে চিন্তা করিতেছিল। অপরাহ্ণ হইয়া আসিয়াছিল, তবু সে উঠিতে পারে নাই। সকালের মৃদু লাঞ্ছনার পর দুপুরবেলা এ ঘরে তাহাকে ভাত দিতে আসিয়া স্বর্ণ আর এক দফা এই উপলক্ষে ও-জিনিষটির চূড়ান্ত করিয়া গিয়াছে। মোট কথা, সে বাঁচুক, মরুক, স্ত্রীর হার তাহাকে যেখান হইতে হউক সর্ব্বাগ্রে হাজির করিয়া আনিয়া দিতে হইবে, নইলে—

সহসা ক্ষুদ্র জানালার বাহিরে স্বর্ণর মুখ ভাসিয়া উঠিল। গম্ভীর চাপাকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "এ বেলা ভাত খাবে, না ফলার-টলার চলবে ?

আড় হইয়া পড়িয়া থাকিয়া তিনকড়ি কহিল,—"কিছুই খাব না, শরীরটা বড্ড খারাপ লাগছে।"

"কি রকম খারাপ ? পেটের কোন—জানি যে, সবদিকে তুমি সর্ব্বনাশ না ক'রে আর ছাড়বে না। বাইরের গ্যাস ঘরে ঢুকিয়ে—বাড়ীর দিককার এ জানালা খবরদার আর তুমি খুলে রেখো না।" বলিয়াই শশব্যস্তে জানালার কবাট বাহির হইতে ভেজাইয়া দিয়া স্বর্ণ ভিতরে চলিয়া গেল।

* * * *

"ক্ষিতীশ, এর আগে ঠিক তোমায় চিনতে পারিনি, আজ চিনলুম। আচ্ছা, তুমি কি মদ খাও ?"

"পেলে একটু আধটু খাই।"

"শুনিচি, গাঁজাও——"

"হ্যাঁ, কেউ দিলে আর ফিরাই না।"

"আচ্ছা, এ রকম নেশা কর কেন?"

"নেশা ঠিক করি না, এম্নিই খাই; অর্থাৎ কিছুতেই বাধে না আর কি! অন্য সময় হয় ত একটা বিড়িও খাই না, আবার দরকার হোলে সবই খাই। মোট কথা ভালছেলের মত জীবনটাকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে আমি চলতে পারি না—চাইও না। ছেলেবেলা থেকে বকাটে ছাড়া কেউত আর ভাল বল্লে না। ঐ আখ্যাটাই মাথা পেতে নিয়ে জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত চলবো। ভাল আর কখনো হতে পারব না খুড়ো।"

অপরাহ্নের পর সায়াহ্ন এবং সায়াহ্ন কাটিয়া রাত্রির অন্ধকার তিনকড়ির গৃহের চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ক্ষুদ্র ঘরখানির এক কোণে মিট্‌মিট্‌ করিয়া একটি কেরোসিনের টেমি জ্বলিতেছিল। কিছু আগে ক্ষিতীশ আসিয়া তাহার অবসন্ন, পীড়িত অন্তরের দুশ্চিন্তাকে বাধা দিয়া বিষয়ান্তরের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তিনকড়ি ক্ষিতীশের কথার পর অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ডাকিল—"আচ্ছা ক্ষিতীশ!"

"কি খুড়ো?"

"বিয়ে তুমি করবে না?"

"না।"

"তবে যে সে দিন বললে, মেয়েমানুষকে পাশে রেখে——"

"হ্যাঁ। আমার নিজের স্ত্রীর সম্বন্ধে সেটা বলিনি—সমস্ত নারীজাতি

কেই মনে ক'রে তা বলেছি। নারীর মর্য্যাদা রাখতে হবে। তাদের অমর্য্যাদায় যে পাপ দেশে ঢুকেছে—দেশের লোককে এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, নইলে দেশের মঙ্গল নেই।

"আচ্ছা, তুমি মুরগীর ডিম খাও ?"

"পেলে খাই।"

"ত'বেলা সন্ধ্যাহ্নিক কর ?"

"সময় পেলে তাঁকে স্মরণ করি, কিন্তু সময়ই ত পাই না। সবই ত তোমাকে এতক্ষণ ধ'রে বললুম, খুড়ো। একটা গাঁয়ের একটা পাড়ার আধি-ব্যাধিতে বুকে তুমি এই ব্যথা পেয়েছ, কিন্তু লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি ভাই-বোন্‌দের কি দুর্দ্দশা, সে সব যদি দেখ, তা হ'লে—নিশ্চিন্দি হয়ে ব'সে মুরগীর ডিম খাবার অবসরও পাই না, সন্ধ্যাহ্নিক করবার সময়ও মেলে না। ও সবের কি আর অবসর আছে খুড়ো ? এই ক'দিন এসেচি, এরি মধ্যে খবর এসেছে—আবার ছুটতে হবে।"

"এখন কোথায় যাবে ?"

বাহির হইতে কে ডাকিল—"চাড়ুয্যে মশাই !"

জমীদার-বাড়ীর পাইক দরজা ঠেলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং কি বিশেষ একটা কাজে বাবুদের বাড়ী হইতে কাল সকালেই একবার তাঁহার তলব পড়িয়াছে, ইহাই জানাইয়া সেই ক্ষীণ লোকটি, তাহার মোটা লাঠিগাছটি হাতে লইয়া বাহিরের অন্ধকারের মধ্যে পুনরায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

কিছু পরে আরও কিছু কথাবার্ত্তার পর ক্ষিতীশও উঠিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন বেলা প্রায় এক প্রহরের সময় জমীদারবাটী হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনকড়ি স্বর্ণকে কহিল, "এখনি ছুটি খেয়ে নিয়ে আমাকে বাবুদের কাজে একবার কোলকাতা যেতে হবে। ছুটি ভাতে ভাত হয়ে উঠবে কি?"

স্বর্ণ চালের বাতা ধরিয়া, উত্তরের পরিবর্ত্তে শুধু একটু যা হাসিল, তাহার ভিতরের উগ্রতা ও শ্লেষ উপলব্ধি করিয়া তিনকড়ি আর কিছুই কহিল না, শুধু তাহার মুখের দিকে শান্ত স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া অত্যন্ত ধীরে ধীরে কহিল, "আজ ষষ্ঠী, আজ আর কিছু আমায় বোলো না স্বর্ণ, এ ক'দিন কারুকে কিছু বলতে নেই। তোমার হার আমি যেমন ক'রে পারি দেবো।" তার পর জুতা, জামা ও ছাতা লইয়া অনাহারেই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। যাইবার সময় কহিল, "হয় ত আজ আর ফিরতে পারব না। রাত্রে ক্ষুদের মা এসে শোবে, ব'লে এলুম।"

স্বর্ণ তেমনই চালের বাতা ধরিয়া দাঁড়াইয়া তিনকড়ির গতির দিকে চাহিয়া রহিল, এবং শেষক্ষণে কহিল, "পার যদি এক শিশি ভাল জর্দ্দা আমার জন্যে এনো।"

বেলা দ্বিপ্রহরের সময় তিনকড়ি হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ী হইতে নামিল এবং হ্যারিসন রোডের মোড় হইতে সর্ব্বাগ্রেই স্বর্ণর এক শিশি জর্দ্দা কিনিল। তার পর বাবুদের কাজ সারিতে তাহার প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল। রাস্তায় জনস্রোতের যেমন শেষ নাই—দোকানে খরিদ্দারেরও তেমনই অন্ত নাই। জামাকাপড়ের দোকানগুলি মাত্রই লোকে লোকারণ্য। এই সব দেখিতে দেখিতে তিনকড়ি উত্তরদিকে কিছু অগ্রসর হইতেই দেখিল. বিস্তৃত জুয়েলারী দোকানের মালিক অজস্র টাকার নয়নমনোবিমোহন অলঙ্কাররাশি প্রস্তুত করিয়া পূজার বাজারে তাঁহার দোকান সাজাইয়া রাখিয়াছেন; স্বর্ণর হারের কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। মূল্যের টাকা থাকিলে আজ সে এখান হইতেই একছড়া পাটী হার কিনিয়া লইয়া যাইত। ফুটপাত হইতে দেখিল, ঠিক সেই রকমেরই পাটী হার আরও অসংখ্য প্রকারের হারের সহিত সো-কেশের মধ্যে সজ্জিত রহিয়াছে। কিন্তু নিরুপায়। এই সূত্রে একবার তাহার স্বর্ণর তিরস্কার, লাঞ্ছনা কটূক্তি মনে পড়িল, বারবার তাহার দৃষ্টি কেবলই সো-কেসের মধ্যস্থ সেই হারছড়াটির উপর পতিত হইতে লাগিল।

এক পা এক পা করিয়া তিনকড়ি ভিতরে প্রবেশ করিল। দোকানের মালিককে হার-ছড়াটির মূল্য জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাইল—ওজনে চার ভরি, দাম একশ পাঁচ টাকা। তিনকড়ি একবার দেখিতে চাহিলে বাবুটি তাহাকে সম্মুখস্থ চেয়া'র দেখাইয়া দিয়া একটু বসিতে বলিলেন।

তদনুযায়ী একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া তিনকড়ি পকেট হইতে বিঁড়ি বাহির করিয়া ধরাইল।

বাবুটি টেলিফোনের চোঙ্‌টি হাতে তুলিয়া লইলেন।

———ক্রিড়িং-ক্রিড়ং-ক্রিড়িং-ক্রিড়িং-ক্রিড়িং————বড়বাজার ওয়ান্‌নট্‌-ফাইভ-নট্‌————ওয়ান্‌-নট্‌-ফাইভ্‌-নট্‌——হাললো—কে আপনি? কেষ্টবাবু? সরকারকে টাকা দিলেন না কেন?—কি বলছেন? এক শ' টাকা দিতে গেছলেন? হ্যাঁ, বিলের সব টাকা না হোলে নিতে বারণ ছিল।———পূজোর পর সব দিয়ে দেবেন?————হ্যাঁ——হ্যাঁ———বুঝিছি—আচ্ছা। ——একশ টাকা এখন নিয়ে আর কি করব?—বেশ———পূজোর পরেই হবে।———এ একশ' টাকা না নিলে খরচ-পত্তর হোয়ে যাবে বলছেন? কিন্তু লোকজন এখন কেউ নেই, কাকে পাঠাই? থাক্‌, পূজোর পরেই হবে।———বুঝিছি————হ্যাঁ————হ্যাঁ———হাসালেন আপনি!——বলেন কি!——আচ্ছা——নমস্কার! নমস্কার!"

অতঃপর বাবুটি সো-কেসের মধ্য হইতে হার-ছড়াটি বাহির করিয়া তিনকড়ির হাতে দিল। মিনিট দুই তিন ধরিয়া তিনকড়ি তাহা দেখিবার পর বাবুটির হাতে তাহা ফিরাইয়া দিল এবং ধীরে ধীরে দোকানের বাহির হইয়া গেল।

বৌবাজারের যে বাবুটির বাসায় জমীদার বাবুদের কার্য্যের জন্য তিনকড়ি আসিয়াছিল, সেই বাসার সুসজ্জিত বৈঠকখানায় টেলিফোন ছিল। বাবুটি এইমাত্র সকলের পূজার কাপড়-চোপড় ইত্যাদি আনিয়াছেন, তাহাই লইয়া আন্দরের চারি-তলায় তখন হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। গৃহিণীর

মনস্তুষ্টির জন্য বাবু সেই চারিতলার উপর ছোটখাট একটি চিড়িয়াখানা করিয়াছিলেন, তাহার পশুপক্ষী পর্য্যন্ত তখন এই গোলমালে মাতিয়া উঠিয়াছিল। তিনকড়ি নির্জ্জন কক্ষমধ্যে টেলিফোনের বহিখানি খুলিয়া ১০৫০ নম্বরের বাবুটির নাম ও ঠিকানা লইয়া টেলিফোনের চোঙটি হাতে তুলিয়া লইল।

কিড়িং ———কিড়িং———কিড়িং———কিড়িং———ওয়ান-নট্-ফাইভ-নট্———হ্যাল্লো! কেষ্টবাবু?————ভেবে দেখলুম-পূজোর সময়টাতে যা পাই, কিছু উপকার হবে'খন।———হ্যাঁ, তাই পাঠাচ্ছি।———একশটাকাই দেবেন———না না, রাগ করব কেন? ———আচ্ছা———লোকজন ত কেউই নেই, একটি নতুন লোক আছেন, তাঁকেই পাঠালুম চেক-টেক যেন দেবেন না, নগদ টাকা দেবেন, কেন না—ব্যাঙ্ক বন্ধ—ভাঙ্গাতে পারব না।———হ্যাঁ, নগদই দেবেন ———আচ্ছা———আমারও হোয়েছে———হুঁ———হুঁ —ও কিছু নয়———বোধ হয় ইনফ্লুয়েঞ্জা———আমারও সর্দ্দীতে গলা বুজে আসছে, দেখছেন না কি রকম কথা কইছি!———সাবধানে থাকবেন———হ্যাঁ হ্যাঁ,———আদা-চা খাবেন————আচ্ছা, নমস্কার নমস্কার!

আজ মহাষ্টমী! গ্রামের বারোয়ারীর দুর্গোৎসবে এবার তেমন আনন্দ নেই। দুলেপাড়া, দাইপাড়া হইতে বহু বলি লইয়া মা যেন এবার সর্ব্বগ্রাসী বুভুক্ষা মিটাইয়া আসিয়াছেন। জগজ্জননী দশভুজার জাঁকজমকপূর্ণ, সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা ঐশ্বর্য্যময়ী মূর্ত্তির পশ্চাতে যেন তাঁহার আলুলায়িতকুন্তলা, ভয়ঙ্করী নগ্নমূর্ত্তি করালবদন ব্যাদান করিয়া বিকট দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন; হাতে রুধিরাক্ত তীক্ষ্ণ খড়্গ, গলায় নরমুণ্ডমালা। তবুও এই সকালবেলা পূজা ও বলি দেখিবার জন্য গাঁয়ের সব লোকই প্রায় জড় হইয়াছিল, এবং এইমাত্র তথায় প্রতিমার সম্মুখে যে বলি হইয়া গেল, এখনও তাহার ঢাক-ঢোলের বাদ্যের রেস যেন বাতাসে বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল।

ক্ষুদের মা বাহির হইতে আসিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"আজও কি শুতে আসতে হবে না কি গা, বৌমা?"

স্বর্ণ তখন সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার পরিয়া বেশ-ভূষার প্রসাধনে ব্যস্ত ছিল, ক্ষুদের মাকে সঙ্গে লইয়া ঠাকুরতলায় ঠাকুর দেখিতে যাইবে। অত্যুজ্জ্বল বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া, আয়নার সম্মুখে সুরভি-সিঞ্চিত কেশদাম পৃষ্ঠে দোলাইয়া, মুখে স্নো মাখিতে মাখিতে স্বর্ণ কহিল,—"কি জানি খুড়ী, কাল ত আসবার কথা ছিল, এল না। আজ এই সকালের গাড়ীতে যদি——"

"সকালের গাড়ী ত কখন্ এসে গেছে, বৌমা! ঐ আমাদের

চণ্ডীদের কে কুটুম এই গাড়ীতে এল যে। গাড়ীর ত আজ লেট্ হোয়েছে। মগরার ইষ্টিসানে কে একজন না কি গাড়ী-চাপা প'ড়ে মরেছে।"

আয়নায় নিজের অপূর্ব্ব সাজসজ্জা দেখিতে দেখিতে স্বর্ণ কহিল, "কে, খুড়ী?"

"কি জানি, বৌমা। বলে,—বেশ না কি ভদ্দর-গোছের নোক, পকেটে টাকা-কড়ি, জর্দ্দার শিশি, সোনার নতুন পাটীহার এক ছড়া—"

পার্শ্বে চৌকীর উপর স্বর্ণ বসিয়া পড়িল।

ক্ষুদের মা তাড়া দিল, "শীগ্‌গীর ক'রে নাও বৌমা, আমার এখনও সব কাজ প'ড়ে রয়েছে, বেলা দুপুর উৎরে গেল।"

মিনিটখানেক পরে ক্ষুদের মা ঘরের দরজার কাছে যাইয়া ডাকিল, "বৌমা!"

শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িয়া স্বর্ণ কহিল,—"তুই বাড়ী যা, আমার শরীর বড্ড অসুখ ক'রে আসছে, আমি যাব না।"

বড়লোকের ঢংয়ের কথা ভাবিতে ভাবিতে ক্ষুদের মা ত্রস্তপদে চলিয়া গেল।

সদরে খিল দেওয়া হইল না, ঘরের কপাট তেমনই উন্মুক্ত হইয়া রহিল, স্বর্ণ এক-গা অলঙ্কার ও বহুমূল্য বস্ত্রাদিতে সজ্জিত হইয়া তেমনই মুখ-গুঁজিয়া শয্যায় পড়িয়া রহিল। সহসা সমস্ত আলোক যেন তাহার চক্ষুর চারিপাশ হইতে নিভিয়া গেল। যেন দুর্ভেদ্য অন্ধকাররাশির মধ্যে তাহাকে লইয়া পৃথিবী নিম্নের মহা-অতলের মধ্যে তলাইয়া যাইতে লাগিল; কোন দিকে যেন কোন অবলম্বন—কোন্ আশ্রয় তাহার রহিল না একটা

দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা তাহার বক্ষঃপঞ্জরে নির্ম্মমভাবে আঘাতের পর আঘাত দিতে লাগিল।

সারা দ্বিপ্রহর এইভাবে কাটিয়া অপরাহ্ণের ছায়া গৃহমধ্যে নিবিড় হইয়া আসিল, তথাপি স্বর্ণ উঠিয়া বসিতে পারিল না। আলুলায়িত কুন্তলদাম মুখে, চোখে, কপালে চারিদিকে একাকার হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; অশ্রুহীন চক্ষু লাল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা উন্মীলন করিবার শক্তি পর্য্যন্ত ছিল না। অন্তঃস্তলের অব্যক্ত ব্যথা ফেনাইয়া উঠিয়া তাহার চোখে-মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

"স্বর্ণ!——অসুখ করেছে?"

বিদ্যুদ্গতিতে স্বর্ণ উঠিয়া বসিতেই দেখিল, তিনকড়ি জর্দ্দার শিশি ও নূতন সোনার হার হাতে করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

স্বর্ণের কথা কহিবার শক্তি ছিল না! রুদ্ধকণ্ঠ ঠেলিয়া অতি ধীরে স্বর বাহির হইল, "তুমি?—তুমি এসে—"

"হ্যাঁ স্বর্ণ, আমি এসেছি! সকালের গাড়ীতেই এসে পৌঁছেছি; ক্ষিতীশের ওখানে ছিলুম। আসতে হয় ত আর পারতুম না। মগরায় ট্রেণের নীচেই হয় ত আজ জীবনের অধ্যায়টা শেষ হয়ে যেত। কিন্তু, কিছুই হোল না, ভগবানের অভিপ্রায় আলাদা। শুধু সামান্য একটু আঘাতই পেলুম।

স্বর্ণ চাহিয়া দেখিল, তিনকড়ির বাম-বাহুতে কাপড়ের পটী বাঁধা রহিয়াছে।

একবার বাহিরের দিকে চাহিয়া তিনকড়ি কহিল, "কিন্তু, বিদায়

নিতে এলুম। এই তোমার হার আর জর্দ্দা। আমি চললুম, স্বর্ণ। বাইরে ক্ষিতিশ দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

স্বর্ণের রুদ্ধকণ্ঠ হইতে কোনমতে স্বর বাহির হইল—"চ'লে যাচ্ছ! কোথায়?"

"সে ক্ষিতীশ জানে। বাংলা দেশে যে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ দুলেপাড়া, দাইপাড়া আছে, যেখানে তাদের দেখবার কেউ নেই, ক্ষিদেয় যারা অন্ন পায় না, তেষ্টায় জল পায় না, রোগে শুশ্রূষা নেই, ভয়ে আশ্বাস নেই,—সেই সব আর্ত্তদের মধ্যে যাচ্ছি, স্বর্ণ! অনেক দুঃখ আমার কাছে হয় ত তুমি পেয়েছ, সব আজ ক্ষমা কোরো। ইচ্ছে হয়, এইখানে থেকো———ইচ্ছে হয়, বাপের বাড়ীতে থেকো। এ বাড়ী-ঘর, জিনিষপত্র, জমী ক'বিঘে, তোমার বাবার অতুল সম্পদের তুলনায় কিছুই নয়। তবুও এ সমস্ত তোমারই। তোমায় বড় ভালবাসি, স্বর্ণ, যাবার সময় আশীর্ব্বাদ ক'রে যাই——— যেখানেই থাক, সুখে থেকো।"

স্বর্ণ মোহাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। মুহূর্ত্ত পরে মুখ তুলিয়া কি বলিতে গিয়া দেখিল,—তিনকড়ি নাই, চলিয়া গিয়াছে, এবং সেইখানকার দেওয়ালে টাঙ্গানো আয়নাখানির ভিতর তাহার নিজেরই সুসজ্জিত প্রতিমূর্ত্তি তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার যেন কোন চেতনা রহিল না। যখন চেতনা হইল, তখন ধীরে ধীরে উঠিয়া টলিতে টলিতে দক্ষিণের জানালার ধারে আসিয়া কাঠের মূর্ত্তির মত দেওয়াল ধরিয়া দাঁড়াইল। এইখানে দাঁড়াইলে বোষ্টমদের ঘরের ফাঁক দিয়া সম্মুখের দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরের সবটা দেখা যায়। এই প্রান্তরের উপর দিয়াই ষ্টেশনে যাইবার পায়ে-চলা পথ

বরাবর চলিয়া গিয়াছিল। স্বর্ণ দেখিল, অসীম উৎসাহে ক্ষিতীশের হাত ধরিয়া তিনকড়ি গর্ব্বোদ্দীপ্ত গতিতে সম্মুখের দিকে চলিয়াছে। পশ্চাতে, দক্ষিণে, বামে, কোন দিকেই তাহার দৃষ্টি নাই। যেন বীরাষ্টমীর দিনে, মহাপ্রাণ বীর, যুদ্ধজয়ান্তে বিশ্বের ব্যথায় বুক পাতিয়া দিবার জন্য মহত্ত্বের পথে অগ্রসর হইতেছে।

. স্বর্ণের মাথা ঘুরিতে লাগিল। অভিভূতের মত সে শয্যাপ্রান্তে বসিয়া পড়িল।

মূল্যদান

তুলসীতলায় সন্ধ্যার দীপ দিয়া পদ্মাবতী প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিতেই পশ্চাৎ হইতে স্বামীর মত্ত কণ্ঠের ডাক শুনিতে পাইল,—পদ্মা!

পদ্মা স্বামীর দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইতেই হরিদাস বিকৃতকণ্ঠে কহিল,—

'তুলসী, তুলসী, তুলসী গো!
চিরকাল এই ভিটেয় থেকো।
লক্ষ্মী যেন এ ঘর ফেলে
যায় না চলে কোনও কালে।'

—তার পর কি, পদ্মা? ভারি মজায় আছ, বাবা তুলসী! ঘরে একটু আলো পড়ে না, তোমার পেছনে মাসে দু'আনার তেল খরচ ঠিক বজায় আছে! দেবো কাল তোমাকে উপড়ে তুলে ফেলে দূর ক'রে!

পদ্মা কহিল, দিনকতক বেশ ত ছিলে; আবার আজ বুঝি খেয়ে এলে?

কিঞ্চিৎ টলিতে টলিতে হরিদাস দাওয়ার উপর উঠিয়া ধপ্ করিয়া একধারে বসিয়া পড়িয়া কহিল, খাই কি আর সাধে। বলিয়াই গান ধরিল—

'সাধে কি গো শ্মশানবাসিনী।
পাগলে করেছে পাগল—'

পদ্মা অদূরে খুঁটি ঠেস্ দিয়া বসিয়া কহিল, হাট কই?

—চৌ-চৌ—

হাট ? হাট, মাঠ, ঘাট সব, পদ্মা, এই পেটে পূরেছি ! খুব বিবেচনা ক'রে কাজটা সম্পন্ন ক'রে ফেলুলুম। ভারি বুদ্ধি খাটাতে হয়েছে, পদ্মা। দেখলুম, এক টাকার হাট ক'রে আনলে, একটা হপ্তা চলবে বটে, কিন্তু তার পর ? তোমার তিরিশ দিনের যোগাড় যখন নেই, তখন দু'চার দিনের হাট ক'রে আর কি হ'বে ? তার পর তোমার ঘরে নেই চাল, ভাঁড়ে নেই তেল, পরণে নেই কাপড়, চালে নেই খড় ! একটা টাকায় ত আর এত সব হবে না। তার চেয়ে—ওঁ গঙ্গাদেবী, বোতলমধ্যস্থাঃ স্বর্ণবর্ণাঃ চোঁক্-চোঁকং ! কেন না, মনে কর তুমি—

স্থিরদৃষ্টিতে হরিদাসের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া পদ্মা কহিল. তুমি খোকার মাথায় হাত দিয়ে সেদিন বলুলে না যে আর কখনো—

ও জিনিষটা ছোঁব না ? —তা, ছুঁই নি, পদ্মা ! সত্যি বলছি ছুঁইনি। আলগোছে মুখের মধ্যে ঢেলে দিয়েছি !

ঘরের মধ্যে খোকা ঘুমাইতেছিল। ঘুম হইতে উঠিয়া সে কাঁদিতে সুরু করিয়া দিল। পদ্মা তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহাকে কোলে লইতে গেল।

পরদিন সকালবেলা দাওয়ার শেষ পৈঠাটার উপর হরিদাস চুপ করিয়া বসিয়াছিল। পদ্মা পাশের বাড়ীতে ঘোষালদের মেজ গিন্নীর কাছ হইতে আড়ি-খানেক চাল ধার করিয়া আনিতে গিয়াছিল। খানিক পরে চাউল লইয়া পদ্মা ফিরিয়া আসিল, জেলে-বৌ খোকার রোজের এক পো দুধ দিতে আসিয়া দামের জন্য তাগাদা দিয়া গেল। উঠানের রৌদ্র হরিদাসের মাথার উপর সরিয়া আসিল, খোকা দাওয়ার উপর কান্না জুড়িয়া দিয়া বাড়ী সরগরম করিয়া তুলিল, কিন্তু হরিদাস উঠানে পা রাখিয়া পৈঠার উপর সেই একভাবেই বসিয়া রহিল। খোকার দিকে

ফিরিয়া দেখিল না, পদ্মার সঙ্গে কথা কহিল না, রৌদ্র হইতে একটু সরিয়াও বসিল না। বহুক্ষণ এইভাবে বসিয়া থাকিবার পর পিছন ফিরিয়া পদ্মার উদ্দেশে কহিল, খোকার দুধের যোগাড় আছে ত?

পদ্মা কহিল, তোমার সামনেই ত জেলে-বৌ দুধ দিয়ে গেল, আর দামের জন্য তাগাদা ক'রে গেল। ও-বাড়ীর মেজ-গিন্নীর কাছ থেকে কিছু চাল ধার ক'রে নিয়ে এলুম। কিন্তু রাঁধবার আর অন্য যোগাড় কিছুই নেই।

তা জানি। সেই জন্যেই ত সুবিধে পেলেই ওই জিনিসটা একটু-আধটু খেয়ে এ সব ভুলে থাকবার চেষ্টা করি। তবে দুঃখের বিষয়, নেশাটা চব্বিশ ঘন্টা, বার মাস, মরবার সময় পর্য্যন্ত থাকে না; ঘন্টা কতক থেকেই তারপর কেটে যায়! বলিতে বলিতে হরিদাস উঠিয়া দাঁড়াইল এবং এক পা এক পা করিয়া সদরের দিকে অগ্রসর হইয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

ঘন্টা দেড়েক পরে হরিদাস ফিরিয়া আসিয়া কহিল, কি আনতে হবে বল। দেখ পদ্মা, যোগেন ডাক্তারের মত বন্ধু বোধ হয় গাঁয়ে আর আমার কেউ নেই। চাইবামাত্রই ফের আজ এক টাকা ধার দিলে।

পদ্মার মুখখানা ঘোর অপ্রসন্নতায় ভরিয়া উঠিল। কহিল, কিন্তু এ সব শুধবে কোত্থেকে, আমি শুধু তাই ভাবছি। যোগেন ডাক্তারের এই নিয়ে বোধ হয় সাত টাকা হল।

কিছুক্ষণ উভয়েই চুপ করিয়া রহিল। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া পদ্মা কহিল, দেখ, আমার রুলী দু'গাছা বিক্রী ক'রে নিয়ে এস। দেনা-পত্তরগুলো শোধ ক'রে, দু' একমাস কষ্টে-সৃষ্টে তবু চলবে এখন। আর

কলকাতায় একবার রমেশের কাছে যাও। তাকে একটু পেড়াপীড়ি ক'রে বল গিয়ে। তার গায়ে ত মানুষের চমড়া আছে।

রমেশ ইহাদের ভাগিনেয়। বাল্যে মাতৃহীন হইয়া হরিদাসের কাছেই সে মানুষ হইয়াছে। এই পলাশবেড়ের স্কুল হইতেই সে ম্যাট্রিক পাশ করে। তার পর "টিউসনি" করিয়া যদিও সে মেসের খরচ আর কলেজের মাহিনা চালায় বটে, কিন্তু 'ল' পর্য্যন্ত প্রত্যেক পরীক্ষার ফী হরিদাসই তাহাকে বরাবর জোগাইয়া আসিয়াছে। হরিদাসের পৈতৃক বিশ বিঘা জমীর অধিকাংশই গিয়াছে রমেশের জন্য। বাকী যৎসামান্য যাহা ছিল, তাহা এই কয় বৎসরে তাহাদের এই দুইটি পেট চালাইতে সব বিক্রয় করিতে হইয়াছে। বর্ত্তমানে আর এক ছটাক জমিও হরিদাসের নাই। আছে পৈতৃক প্রকাণ্ড ভিটার উপর একখানি মাত্র খড়ের ছাওয়া শয়ন-ঘর আর একটু রাঁধিবার চালা। তাহাও বছর বছর গোজা দিয়া আর চলে না। বহুস্থানেই ঘরের ভিতর হইতে আকাশ দেখা যায়। এক একদিন অত্যন্ত দুঃখে হরিদাস স্ত্রী-পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া তাই বলে—

'ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো।
খাই—না খাই, আছি ভালো।

কলিকাতায় রমেশের কাছে যাওয়া সম্বন্ধে উভয়ে পরামর্শ করিয়া এই স্থির করিল যে, যাইবার পূর্ব্বে রমেশকে আর একখানা চিঠি ভাল করিয়া লিখা যাউক।

তাহাই হইল।

কয়েকদিন পরে রমেশের উত্তর আসিল—ভয়ানক দুঃসময় যাইতেছে,

মামলা-মোকর্দ্দমা কিছুই নাই, সংসার অচল। তার ওপর—রোগ, দেনা, দুশ্চিন্তা ইত্যাদি ইত্যাদি। তা' হইলেও পত্রের শেষে ভবিষ্যতের একটা আশা দিয়াছে, মামা-মামীকে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাইয়াছে, খোকাকে প্রাণের ভালবাসা এবং স্নেহাশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিয়াছে।

পত্রপাঠান্তে হরিদাস যোগেন ডাক্তারের উদ্দেশে বাহির হইল, যদি কয়েক আনা পয়সা ধার পায়। তাহা হইলে বৈকুণ্ঠ শুঁড়ীর দোকানে গিয়া দু'চার আউন্স—

* * * *

হরিদাস কলিকাতায় রমেশের কাছে আসিয়াছে। সন্ধ্যার পর মামা-ভাগিনাতে কথোপকথন হইতেছিল।

আমাদের জীবনটাই দুঃখের, মামা! মাঝে মাঝে তাই ভাবি, ভগবান সুস্থমনে দুটি ডালভাতও আমাদের খেতে দেন নি।

শিলং গিয়ে ক'দিন ছিলে?

দিন পনর। নানা রকম ভাবনা-চিন্তায় মনটা বড়ই খারাপ হয়ে উঠলো, ভাবলুম, যাই—দিনকতক একটু ঘুরে আসি। তা, তার কি আর জো আছে। শুধু শুধু এক কাঁড়ি টাকা খরচ হওয়াই সার হল। খোকা বেশ ভাল আছে, মামা?

আছে এক রকম। দুগ্ধপোষ্য শিশু, দুধ ত আর খেতে পায় না। অন্ততঃ আধ সের ক'রেও যদি রোজ দুধ খেতে পেত ছেলেটা!

ও সব কথা ব'লে খালি দুঃখ পাওয়া আর—দুঃখ দেওয়া! বলিয়া রমেশ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

আহারান্তে রমেশ উপরে তাহার ঘরে শুইতে গেলে, সারদা চাকর

হরিদাসকে পাণ দিতে আসিয়া কহিল, বাবু মটর কিনছেন শুনেছেন বোধ হয়? মটরটা এলে একদিন সকলে আমরা তাইতে ক'রে এখান থেকে পলাশবেড় বেড়িয়ে আসব। বরাবর পাকা রাস্তা আছে ত, দাদামশাই?

দেয়ালের গায়ে একখানা নূতন অয়েলপেন্টিং ছবি দেখাইয়া হরিদাস জিজ্ঞাসা করিল, এখানা ত এখানে ছিল না রে?

ও ত এই সেদিন কেনা হয়েছে। কোথায় ছবির 'মেলা' হয়েছিল, তাই দেখতে গিয়ে বাবু কিনে এনেছেন। দু'শ টাকা দাম ওর, দাদামশাই!

পরদিন হরিদাসের বাড়ী ফিরিবার সময়, রমেশ তাহার হাতে একখানা পাঁচটাকার নোট দিয়া দুঃখের সঙ্গে কহিল, এমনই ভাগ্য নিয়ে জগতে এসেছিলুম যে, সহস্র চেষ্টা করেও আপনাদের একটু সুখে রাখবার ব্যবস্থাটা আর ক'রে উঠতে পারলুম না। আমারও দুর্ভাগ্য! আপনাদেরও দুর্ভাগ্য! সারাদিন গাধার খাটুনি খেটে দু'বেলা দু'মুঠো ডাল-ভাত মুখে তোলা ছাড়া আর কিছুই হয় না!

সন্ধ্যার প্রাক্কালে হরিদাস যখন কলিকাতা হইতে বাটী ফিরিল, তখন সেদিনের মতই তাহার পা টলিতেছিল এবং কণ্ঠস্বর কথঞ্চিৎ বিকৃত। পদ্মার হাতে দুইটি টাকা এবং তেরটি পয়সা দিয়া বলিল, হিসেবটা দিয়ে দি। যাতায়াতের ট্রেণ আর ট্রামভাড়া দু'টাকা তিন আনা। পথে পাণ-বিড়ি এক আনা। আর আজ সেখানে সিকি কোয়াটার আর এখানে এসে সিকি কোয়াটার—কোয়াটার কোয়াটার তুমি কিছু বুঝবে না, সোজা হিসেবে বলি;—এই মোট ঐ দ্রব্যটিতে গেছে আঠার আনা, অর্থাৎ একটাকা দু'আনা। এর মধ্যে জমা ধর পাঁচ সিকে আর পাঁচ

টাকা। নিয়ে গেছলুম—পাঁচ সিকে আর সেখানে পেয়েছি পাঁচ টাকা। —যাক্, এই দু'টাকা তের পয়সার এখন ভাগাভাগি কর।

খোকা ঘরের মধ্যে একটা বিস্কুটের টীন, কতকগুলা খোলামকুচি ও একরাশ তেঁতুলবীচি লইয়া ব্যস্ত ছিল। পিতার শেষ কথায় সে তথা হইতে বলিয়া উঠিল, ভাগা-ভাগ্ কলো!

হরিদাস তাহাকে কোলে তুলিয়া আনিয়া কহিল, তোমার ভাগে ঐ তের পয়সাই শুধু। তিন বছর বয়স হোতে চল্লো, এখনো সব কথা স্পষ্ট যখন বার হয় না, তখন তের পয়সার এক আধলা বেশী পাবে না।

খোকা কহিল, বেথি পাবে না?

কি ক'রে পাবে? বল্তে হবে—রাম।

আম!

আম নয়, রাম বল।

আম।

তা হোলে ঐ তের পয়সা, তোমার হ'ল তের পয়সা আমার এক টাকা আর পদ্মা, তোমার এক টাকা। তিন জনের মধ্যে এ যা ভাগ ক'রে দিলুম, এ একেবারে চূড়ন্ত! একে বলে—ত্রৈরাশিক; রুল অফ থ্রী, ইনটারেষ্ট, কম্পাউণ্ড ইণ্টারেষ্ট, কস্‌মোসেন্টি—লিটিফিকেসন, ননপ্রুডিমন্টিমিটারিয়ান্‌সিসিস্—

পদ্মা ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল। হরিদাস তখন খোকাকে লইয়া পড়িল।

ইহারই দুই চারিদিন পরে একদিন বৃষ্টিতে খুব ভিজিয়া হরিদাস জর করিয়া বসিল। এ রকম বৃষ্টিতে আগে সে অনেক ভিজিয়াছে,

কিন্তু কখনো এরকম জ্বরে পড়ে নাই। জ্বর, তাহার সঙ্গে বুকে একটু ব্যথা আর কাসি। বিছানায় শুইয়া উপবাস সুরু হইল। কিন্তু জ্বরও কমে না, বুকের ব্যথা আর কাসিও কমে না। যোগেন ডাক্তারকে খবর দেওয়া হইল। যোগেন আসিয়া, দেখিয়া শুনিয়া ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া গেল।

সাত দিনের রোগভোগেই হরিদাস কাবু হইয়া পড়িল। পদ্মাকে কহিল, পদ্মা, আমার পথ বোধ করি হঠাৎ এইখানেই শেষ। এখনো কিন্তু অনেকটা বেলা র'য়েছে। তাই ত। বেলা শেষ না হতেই যে আমার পথের শেষ হ'য়ে যাবে, এ কথা ত ভাবি নি, পদ্মা!

পদ্মা কহিল, কি বল যে তার ঠিক নেই। চুপ ক'রে শুয়ে থাক। ক'টা বাজলো? ওষুধ খাবার সময় হয় নি কি?

খোকা সেদিনের সেই বিস্কুটের টিন লইয়া উঠানে খেলা করিতেছিল। তবে আজ তাহার মধ্যে তেঁতুলবীচি ছিল না। তাহার স্থানে আজ ছিল, একটা খালি দিয়াশলাইএর বাক্স, খানিকটা কাপড়ের পাড়, নারিকেলের একটা মুচি, একটা লোহার ভাঙ্গা কব্জা, দু'খানা পোষ্টকার্ডের চিঠি আর দু' একটা এ-ও-তা।

খোকা আসিয়াই পদ্মার গলা জড়াইয়া কহিল, খিদে পেয়েথে, মা।

হরিদাসের বোধ হয় জ্বর আজ অন্য দিনের চেয়ে একটু বেশী আসিয়াছিল। খোকার দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, বলতে হবে—রাম।

মুখখানাকে দোলাইয়া খোকা বলিল, আম!

রাম—রাম।

আম—আম।

আজ গভীর পুত্রস্নেহে হরিদাসের রক্তচক্ষু ছলছল্ করিয়া উঠিল। কহিল, ওরে আমার মধু-গুল্‌গুলি আম, আজ আমার কাছে একবার আয় ত। আজ তোর মাথা ছুঁয়ে আমি ঠিকই দিব্যি করব।

কি বল্‌বে মাথা থুঁয়ে?

দিব্যি করবো যে, আর কখনো ও জিনিষটা খাব না।

খোকা তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলে হরিদাস তাহার মাথায় হাত রাখিয়া সেই শপথ করিল। পদ্মার দিকে চাহিয়া কহিল, তোমার কাছে ওর মাথায় হাত দিয়ে বলার যে গভীরতা, সেই গভীরতা স্মরণ করেই আজ দিব্যি করলুম, পদ্মা! এইবার দেখো।

হরিদাস অক্ষরে অক্ষরে তাহার শপথ পালন করিল। ইহার পর যে তিনটি দিন সে শয্যায় শুইয়া ছট্‌ফট্ করিয়াছিল, সে অবস্থায় বৈকুণ্ঠ শুঁড়ির দোকানে যাওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব। তাহার পর সকল যন্ত্রণার শেষ করিয়া সে যেখানে চলিয়া গেল, সেখান হইতে কেহই আর বৈকুণ্ঠের দোকানে আসিতে পারে না। তাহা অসম্ভবেরও অসম্ভব, তাহা বিধি-বিধানের একান্তই বহির্ভূত।

হরিদাসের অনাড়ম্বর মৃত্যুর তুলনায় তাহার শ্রাদ্ধটা কিন্তু হইল বেশ একটু আড়ম্বরের সহিত।

অসুখের সময় কলিকাতায় রমেশকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল এবং চিকিৎসার জন্য কিছু সাহায্য চাওয়া হইয়াছিল। রমেশের নিকট হইতে সে চিঠির কোন প্রত্যুত্তর আসে নাই। তার পর মাতুলের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া সে অধীর হইয়া তাহার নূতন মোটরে চাপিয়া ছুটিয়া

আসে এবং গভীর শোকে একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়ে। সকলকে বলে, মামার শোক আমি কি ক'রে সহ্য করব জানি না। আমি এমন সময় পেলুম না যে, কলকাতা থেকে কোন বড় ডাক্তারকে নিয়ে এসে দেখাই। এ আপশোষ জীবনে আমার যাবে না।

তার পর নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া মাতুলের শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিল। পলাশবেড়ের ইতর-ভদ্র সকলকেই পরিতোষ-সহকারে খাওয়ান হইল। সকল কার্য্য শেষ হইয়া গেলে হিসাব হইল, চারিশত টাকার উপর রমেশের ব্যয় হইয়াছে। হরিদাসের মৃত আত্মা ইহাতে তৃপ্ত কি অতৃপ্ত হইয়াছে, জানি না, আর ইহাও জানিবার উপায় নাই যে, সেই আত্মা শূন্য বায়ুমণ্ডলে এই কথা বলিয়া বলিয়া ফিরিতেছে কি না, রমেশ রে! মরবার পর যে টাকাটা ব্যয় করলি, সেটা যদি জীবদ্দশায় আমায় দিতিস, তাহলে এত অসময়ে, এত কষ্টে প্রাণটা এমন ক'রে পুড়ে পুড়ে আর যেত না!

যাহা হউক, কায-কর্ম্ম সব চুকিয়া গেলে রমেশ পদ্মাকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল। পদ্মার গ্রাম ছাড়িয়া যাওয়াতে গ্রামের সকলেই দুঃখিত হইল। কিন্তু না গিয়া উপায়ই বা কি! অনাথকে এখানে কে দেখিবে?

প্রথম মাস দুই তিন পদ্মার কলিকাতায় একরূপ কাটিল। কিন্তু তাহার পর ভাগিনেয়র সংসারে থাকা তাহার পক্ষে বিষম দায় হইয়া উঠিল। রমেশের সংসারে তাহার শ্বশ্রূই কর্ত্রী। পদ্মা এ বাটীতে আসা অবধি তিনি মনে মনে অসন্তুষ্ট। এই তিন মাসকাল সংসারে যাবতীয় খাটা-খাটুনীর কায করিয়াও পদ্মা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিল না।

এত পরাধীন ভাবে, এত অনাদরে, এত উপেক্ষায় কখনো তাহার দিন কাটে নাই। সবের উপর, খোকার অত্যন্ত অযত্ন হইতে লাগিল। পলাশবেড়েতে তাহার দুঃখের সংসারে তবু খোকা দুই বেলা এক পো করিয়া দুধ খাইতে পাইত, কিন্তু এখানে আসিবার পর সে আর দুধের মুখ দেখিতে পায় নাই। রমেশ মামীমার বিষয়ে একেবারেই উদাসীন ছিল। সে কিছু দেখিয়াও দেখিত না, শুনিয়াও শুনিত না।

এই সব দেখিয়া শুনিয়া সদ্যোবিধবা দুঃখিনী পদ্মার অন্তরে ব্যথা রাখিবার আর স্থান রহিল না। পদ্মা ভাবিল পলাশবেড়ে ফিরিয়া যাওয়া তাহার ভাল। সে পথের ভিখারিণী হইলেও, পলাশবেড়ের ভিটা তাহার অতুল সম্পত্তি। খোকা এখন প্রায় সব কথাই উচ্চারণ করিতে পারে। প্রায় নিত্যই সে পদ্মার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলে, 'বালী তলো না, মা! --সে সব কষ্ট সহ্য করিতে পারে, কিন্তু খোকার কোন কষ্ট তাহার স্নেহ-কোমল প্রাণে সহ্য হয় না। তিন বছরের শিশুও অনাদর-অযত্ন বুঝিতে পারে! তাই খোকার 'বালী তলো না, মা'র সংখ্যাটা যেন দিন দিনই বাড়িয়া চলিতে লাগিল। সুতরাং পদ্মা স্থির করিল, সে পলাশবেড়েতেই যাইবে। সেখানে সুখে থাকুক, দুঃখে থাকুক, সেই তাহার স্থান। সেখানে যদি অনাহারে থাকিতে হয়, সে-ও ভাল।

এক দিন শ্রাবণের সায়াহ্নে খোকাকে কোলে লইয়া পদ্মা তাহার পলাশবেড়ের ভগ্নগৃহে আসিয়া প্রবেশ করিল।

ঘোষালদের মেজগিন্নী আসিয়া কহিল, বৌ, স্বামীর ভিটেতে বুক দিয়ে পড়ে থাক্, ভগবান্ যেমন ক'রে হোক একমুঠো যোগাবেই।

যোগেন ডাক্তার এক দিন এ-পাড়ায় রুগী দেখিতে আসিয়া বলিয়া গেল, বৌদি, আমরা রইলুম, কিচ্ছুটি আপনি ভাববেন না।

যাহা হউক, দুঃখে কষ্টে দিনের পর দিন কাটিয়া পলাশবেড়েতে পদ্মার প্রায় তিন মাস কাটিয়া যাইবার পর হঠাৎ এক দিন খোকার খুব জ্বর হইল। জ্বরের যন্ত্রণায় সারাদিন সে বেহুঁস হইয়া পড়িয়া রহিল। পদ্মা তাহাকে কোলের গোড়ায় করিয়া সারা দিন-রাত কাটাইল। পর দিন সকালবেলা কিছুক্ষণের জন্য জ্বর ছাড়িল বটে, কিন্তু দুপুরের আগেই আবার জ্বর আসিল। খোকার তিন বছর বয়স উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সে এখন আর রামকে আম বা নাম বলে না, রামই বলিতে পারে। তাহা ছাড়া যাবতীয় সব কথাই সে এখন প্রায় বলিতে শিখিয়াছে।

সমস্ত দুপুর ছট্‌ফট্‌ করিয়া বৈকালের দিকে সে পদ্মার মুখের দিকে তাকাইয়া ডাকিল, মা?

কেন বাবা!

বদ্দো গলম্ লাগ্‌তে, হাবা কলো না!

আর কি হচ্ছে, বাবা?

আল্? এই বুকে লাগ্‌তে।

লাগ্‌ছে? ব্যথা করছে?

হ্যাঁ, ব্যথা কল্‌ছে, মা!

আতঙ্কে পদ্মার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল! হরিদাসেরও এই জ্বর আর বুকে ব্যথা উপসর্গ হইয়াছিল। পদ্মা তখনই যোগেন ডাক্তারের কাছে এক জন লোক পাঠাইল।

যোগেন ডাক্তার আসিয়া খোকাকে দেখিল। তাহার মুখখানা অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। পদ্মাকে বলিল, বৌদি, কিছু ভাববেন না। যে ওষুধ পাঠিয়ে দোবো, তাই খাইয়ে দিন, আর মাথায় অনবরত জলপটি দিন।

ও-বাড়ীর মেজগিন্নী পদ্মার কাছে আসিয়া রহিল। মেজগিন্নী কহিল, বৌ, কাল সারা রাত ত ঘুমুতে পাস্‌নি, আজ তুই ঘুমো, খোকার কাছে আমি জাগবো এখন। পদ্মা কোন কথা বলিল না। মনে মনে কহিল, নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাবারই সময় আমার এসেছে বটে!

ঔষধ-পত্র সেবা-শুশ্রূষার কোনই ত্রুটি হইল না, কিন্তু সে রাত্রে খোকার গায়ের তাপ আর যন্ত্রণা যেন আরও বাড়িল। ভোরের দিকে চোখ দু'টা রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সকালেই যোগেন ডাক্তার আসিল। পদ্মা কহিল, ঠাকুরপো, কি হ'বে?

কি আর হবে, সেরে যাবে, বৌদি। তবে রোগটা একটু বাঁকা পথ নেবে বোধ হ'চ্ছে।

পদ্মা আর কোনই কথা কহিল না। নিজের মনে কহিল, বাঁকা পথ। আচ্ছা—আমারও তা' হলে সোজা পথ আছে!

বৈকালের দিকে খোকার চৈতন্য বিলুপ্ত হইল, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের টান দীর্ঘ হইয়া পড়িল, আরক্ত চক্ষু মুদ্রিত হইল। যোগেন ডাক্তার মনে মনে প্রমাদ গণিল।

পদ্মা সারাদিনের মধ্যে একবারও খোকার কাছ হইতে উঠে নাই। মেজগিন্নী কহিল, রান্না ঘরে তোর ভাত তরকারী ঢাকা রয়েছে, যা' হোক দু'টি খেয়ে আয়, বৌ। পদ্মা উঠিল না, সেই একভাবেই খোকার

পাশে বসিয়া রহিল। হঠাৎ তাহার কি মনে হইল, সে লাফাইয়া উঠিয়া পড়িল। মেজগিন্নীকে কহিল, একবার ধর ত দিদি, খোকার বিছানাটা ওধারে সরিয়ে ফেলি।

চমকাইয়া উঠিয়া মেজগিন্নী কহিল, কেন রে, বৌ?

টস্ টস্ করিয়া চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে পদ্মা কহিল, কি হবে আমার বরাতে, দিদি, জানি না। ঠিক এইখানে এই জায়গাতেই তিনি যে দিদি—

তাড়াতাড়ি সন্তর্পণে ধরিয়া পদ্মা খোকার বিছানা অন্য পাশে লইয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় যোগেন ডাক্তার আর একবার আসিয়া দেখিল, অবস্থার কিছুই পরিবর্তন হয় নাই। রাত্রে আর একবার আসিয়া দেখিয়া যাইবে বলিয়া সে চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, কপালে আর মাথায় অনবরত জলপটি যেন দেওয়া হয়।—বৈকালেই খোকার মাথা নেড়া করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

অনেক রাত্রে যোগেন ডাক্তার আর একবার আসিল। তখনও খোকার জ্ঞান হয় নাই। চক্ষু মুদ্রিত। যোগেন ডাক্তার বিমর্ষ মুখে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। মেজগিন্নী পদ্মাকে দুটি খাইয়া আসিবার জন্য বার বার বলিতে লাগিল। যোগেনও কহিল, যান না বৌদি, এ রকম না খেয়ে কদ্দিন থাকবেন? খোকা ভাল হয়ে যাবে, আপনি ভাবছেন কেন?

অনেক পীড়াপীড়িতে পদ্মা দু'টি খাইবার জন্য উঠিয়া রান্নাঘরের দিকে গেল। তার পর কি ভাবিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া সকলের

অলক্ষ্যে বাহিরে জানালার পার্শ্বে আসিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল। যোগেন ডাক্তার তখন মেজগিন্নীকে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিতেছিল, খুব সম্ভব, শেষ রাতেই হয়ে যাবে—আর কি! তবে—

ওইটুকু মাত্র শুনিয়া পদ্মা আর কিছু শুনিতে পাইল না। গভীর রাত্রের সাঁই সাঁই শব্দ যেন এক সঙ্গে তাহার কাণে ঢুকিয়া কাণ বন্ধ করিয়া দিল। সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া যেন ভূমিকম্প সুরু হইল। পদ্মা টলিতে টলিতে—রান্নাঘরে নয়—খিড়কীর দিকে চলিয়া গেল। অন্ধকারে খোকার সেই বিস্কুটের টীনটা তাহার পায়ে লাগিয়া ঝনাৎ করিয়া শব্দ হইল। সেদিন সকালে এইখানে বসিয়া খোকা তাহার ঐ বিস্কুটের টীন, মাটীর সরা, কতকগুলা কচুশাক, ইট-পাটকেল লইয়া দোকান পাতিয়া খেলা করিতেই তাহার জ্বর আসে। সেগুলা সেখানেই সেই ভাবেই পড়িয়াছিল। খিড়কীর দরজা খুলিয়া পদ্মা বাহির হইয়া গেল। চতুর্দ্দিকে ঘোর অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে পদ্মা পাগলের মত ছুটিল। খোকার মৃত্যু সে দেখিতে পারিবে না।

ঘরের মধ্যে যোগেন ডাক্তার তেমনি ফিস্ ফিস্ করিয়া মেজগিন্নীকে বলিতে লাগিল, রাতের মধ্যে জ্ঞান ফিরেও আসতে পারে, তবে লক্ষণ কিছু দেখছি না। জলপটি না বন্ধ যায়। যদি বেঁচে থাকে, তা হলে ভোরের দিকে একটা খবর যেন আমি পাই।

যোগেন চলিয়া যাইতেছিল, মেজগিন্নী বলিল, বৌ খেয়ে এলে তার পর তুমি যেও।—বলিয়া মেজগিন্নী খোকার শিয়রে ধারে আসিয়া বসিল। কিন্তু বহুক্ষণ অতীত হইয়া গেলেও পদ্মা রান্নাঘর হইতে খাইয়া ফিরিল না। মেজগিন্নী একবার ডাক দিল, কোন সাড়া আসিল না। আরও

বহুক্ষণ কাটিয়া যাইবার পর, যোগেন ডাক্তার কহিল, দেখ ত দিদি, এত দেরী হচ্ছে কেন? মেজগিন্নী আসিয়া দেখিল, রান্নাঘর শিকল বন্ধ, পদ্মা তথায় নাই। হ্যারিকেনের আলো হাতে ইতস্ততঃ দেখিতেই দেখিতে পাইল যে, খিড়কীর দরজা খোলা। মেজগিন্নী দীঘির ঘাট পর্য্যন্ত দেখিয়া আসিল, 'বৌ' বৌ' বলিয়া অনেক ডাকিল, কিন্তু কোথাও পদ্মার সন্ধান পাইল না। মেজগিন্নীর মুখে সমস্ত শুনিয়া যোগেন ডাক্তার বিচলিত হইয়া পড়িল। সেই রাত্রে চারিদিকেই পদ্মার খোঁজ চলিতে লাগিল, কিন্তু কেহই কোন সন্ধান করিতে পারিল না।

পদ্মা! পদ্মা! তুমি কোথায়? খোকাকে একলা ফেলে এতক্ষণ তুমি কোথায় আছ? ভোর হয়েছে, কাক-পক্ষী জেগেছে, তোমার খোকার জ্ঞান হয়েছে, সে তার চোখ চেয়েছে, মা ব'লে সে তোমাকে খুঁজছে, তুমি আসবে না? তোমার জীবনসর্ব্বস্ব খোকাকে তুমি কোলে নেবে না?

—তোমার খোকার যে জ্ঞান ফিরে এসেছে। তুমি কি মূল্যে তাকে আবার ফিরে আনলে? ফিরে এসে সে যে তোমায় খুঁজছে—বলবে বলে, "বদ্দ গলম লাগ্‌তে মা, একটু হাবা কলো না।" তা তুমি কি আসবে না, পদ্মা—আসবে না?

উদয়াচলে ঈষৎ আলো দেখা দিবার সঙ্গে সঙ্গে সুপ্ত জীব-জগৎ চতুর্দ্দিক্ হইতে যেন 'না-না' বলিয়া জাগিতে সুরু করিল। আর সেই আলোকে সকলে দেখিল, খিড়কীর 'বোষ্টম-দীঘি'র বায়ু-কোণে ফুটন্ত পদ্মবনের মধ্যে আর এক নিথর পদ্ম ঊর্দ্ধমুখে ভাসিয়া রহিয়াছে।

পয়সা-প্রাসাদ

নিত্যানন্দের ৩৬ বছরের দীর্ঘ জীবন-সূত্রটার পাক খুলিতে খুলিতে একেবারে তার মূলে গিয়া পৌঁছিলে জানিতে পারা যাইবে যে, ১৩০৭ সালের ১৭ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার, বেলা ৩টা ২৫ মিনিট ১৩ সেকেণ্ডের সময় যখন সে মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, তখন প্রসবকারিণী ধাত্রী, সারদার মা, হাতের গোড়ায় আর কোন দ্রব্য না পাইয়া পার্শ্বের কুলুঙ্গী হইতে একখানা ভাঁজ-করা খবরের কাগজ টানিয়া লইয়া আঁতুড়-ঘরের কাঁচা মেজের উপর পাতিয়াছিল এবং তাহার উপরেই নবোজাত শিশুকে রক্ষা করিয়াছিল। কাগজখানি—তখনকার দিনের বিখ্যাত 'বঙ্গবাসী'। উহার যে স্থানটি জুড়িয়া শিশুকে শয়ন করান হইয়াছিল, সেই স্থানটীতে 'পঞ্চানন্দে'র একটি কবিতার শেষ অংশ এবং একটি গল্পের প্রথম অংশ ছাপা ছিল। এই সামান্য ব্যাপারটা সে সময়ে কাহারো লক্ষ্যের মধ্যেই আসে নাই। দৈবের এই যোগাযোগ হইতে যে কি হইতে পারে, সে চিন্তামাত্রও তখন কাহারও মনে উদয় হয় নাই। তাই বর্ত্তমানে তাহার লিখিবার ক্ষমতা দেখিয়া যখন পাড়ার সকলে হাঁ করিয়া তাহার মুখের দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে, তাহার খাতা হইতে

তাহার রচিত অপ্রকাশিত কবিতা ও গল্প-পাঠে বিস্ময়ের সহিত মুগ্ধ হইয়া পড়ে এবং তাহার গৃহিণী অনর্থক মুখ ঝাম্‌টা দিয়া বলে—দিন-রাত খালি ঐ ছায়ের লেখা,—তখন অন্তরালে থাকিয়া বিধাতা-পুরুষ শুধু মৃদু মৃদু হাসিতে থাকেন।

সেদিন নিত্যানন্দ কবিতা লইয়া পড়িয়াছিল। যে কয় ছত্র সে লিখিয়াছিল, তাহা এই :—

পথের বন্ধু ওগো মোর প্রিয়—ওগো ভাই!
সারা জগতের রত্ন ফেলিয়া তোমারেই আমি চাই।
—তুমি স্বপ্নলোকের প্রিয়া।
তব পদতলে দিছি লুটাইয়া এ মোর ব্যাকুল হিয়া।

এই চারি ছত্র লেখা হইবার পর, পঞ্চম ছত্রের জন্য যখন সে মাথা ঘামাইতে অতিশয় ব্যস্ত, তখন তাহার পথের বন্ধু, স্বপ্নলোকের প্রিয়া—শ্রীমতী কুঞ্জলতা, মুখখানাকে অসম্ভব ভারি করিয়া তাহার কাব্য-কুঞ্জে আসিয়া দেখা দিল এবং বিষম বিরক্তির সহিত কহিল, আচ্ছা,—দিনরাত ভালও ত লাগে! তবু যদি বুঝতুম, ওর থেকে দু'পয়সা ঘরে আসবে! দেখ, চল্লিশ বছর বয়স হ'তে চল্লো, নেহাৎ ত আর খোকাটি নও; একটু হুঁস করতে হয়!

নিত্যানন্দ কলমটি একধারে রাখিয়া কহিল, কিসের হুঁস করব বল? হুঁস ত সব জিনিসেই আছে আমার।

কোন কিছুতেই নেই। ক'দিন ধরে যে বলছি, যে—ঘরে চাল নেই, তেল ফুরিয়ে আসছে, সাজিমাটী এনে দিতে হবে—কাপড়-চোপড়গুলো একদিন সব ক্ষারে দেব, গোয়ালটার একখানা আগড় বাঁধিয়ে নিতে

হবে,—তা কিছুই ত তোমার দেখছি খেয়াল হয় না। আজ সিধুর মা'র কাছ থেকে এক আড়ি চাল ধার ক'রে তবে হাঁড়ি চাপালুম।

নিত্যানন্দ এবার কবিতায় জবাব দিল—

অয়ি কুঞ্জলতা—
মম প্রাণ-মন-বিমোহিনী।
মম প্রেম-সরোবরমাঝে
প্রফুল্ল কমল-রাশি
—বল এই ভাবে।
এমনি মধুর ভাবে করহ তাড়না।
যাতে করে মোর............

চোখের দৃষ্টিতে আগুন ছড়াইয়া, একটা তীব্র কিছু কুঞ্জলতা বলিতে যাইতেছিল; কিন্তু কোন কথাই তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। সে কয়েক সেকেণ্ড স্বামীর দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিবার পর সেখান হইতে চলিয়া গেল। শুধু শোনা গেল—তাহার অন্তরের সমস্ত ঘৃণা-মাখানো একটা—'ছিঃ'!

সেই দিনই সন্ধ্যার পর পাড়া বেড়াইয়া আসিয়া নিত্যানন্দ ব্যস্ত হইয়া ডাকিল, কুঞ্জ! কুঞ্জ!—কুঞ্জলতা তখন ভাত চড়াইয়া দিয়া, রান্নাঘরে বসিয়া কুট্না কুটিতেছিল। সেইখান হইতেই সাড়া দিল,—কেন? কুঞ্জ কি করবে? নিত্যানন্দ গিয়া রান্নাঘরেই প্রবেশ করিল; কহিল, তোমার জন্যে একটা জিনিষ এনেছি। বলিয়া একটা চাঁপা ফুল কুঞ্জর খোঁপায় গুঁজিয়া দিল। ব্যাপারটার উপর কুঞ্জ বিশেষ কোন মনোযোগ না দিয়া যেমন কুট্না কুটিতেছিল তেমনি কুট্না কুটিয়া যাইতে লাগিল।

শুধু কহিল, বোশেখী-চাঁপার ব্রত নিয়েছ নাকি? নিত্যানন্দ কহিল, বোশেখী-চাঁপার ব্রত নয়। আর জন্মে যেন এইরকম চাঁপা ফুল হ'য়ে তোমার খোঁপায় থাকতে পাই।

তা'তে আর সুখটা এমন কি হবে? বাসি হোলেই ত ফেলে দেবো।

বাসি হওয়া পর্য্যন্ত যে সুখ, সেইটুকুই ত মহাসুখ!

তা—সে মহাসুখ ত একজন্ম পরের কথা; এদিকে যে মহাজন এসে বিকেলে হাজির হ'য়েছিল। নানান্ কথা ব'লে গেল।

গগন হালদার বুঝি? দেখাচ্ছি বেটাকে—

তার অপরাধটা কি যে তাকে—দেখাবে? টাকা ধার ক'রেছ, না দিলে তাগাদা করতে আসবে না? আচ্ছা, বারমাস ঘরে বসে বসে এই রকম খেলে, সংসারই বা চালাবে কোত্থেকে আর দেনা-পত্তরই বা শুধবে কি ক'রে?

ঐ যে তোমার খোঁপায় চাঁপা ফুলটি আজ গুঁজে দিলুম, ওইটি রোজ একবার ক'রে হাত দিয়ে দেখবে। যেদিন ওটা তাজা হ'য়ে উঠবে, সেইদিন আমার দেনা-পত্তর সব ক্লিয়ার জান্‌বে।

একটুখানি ব্যঙ্গ-ভরা হাসি হাসিতে হাসিতে কুঞ্জ কহিল, কোন গুপ্ত ধন-টন কিছু পাবার আশা আছে, না, কোন জমিদারের পুষ্যিপুত্তুর হবে, তেমন কিছু ব্যবস্থা হচ্ছে?

ব্যবস্থা যা হচ্ছে, তা কখনো হয় নি, হবে না; অর্থাৎ 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি!' মনে করছি, তোমাকে চোদ্দবছরের ওপর এই বনবাসে রেখেছি, আর এখানে রাখব না। এইবার—

অযোধ্যার নিয়ে গিয়ে রাজসিংহাসনে তোমার পাশে রাণী ক'রে বসাবে ?

তাই বসাবো। মাখনপুর এইবার ত্যাগ করছি।·ক'রে—কলকাতায় থাকবো। এই বন-জঙ্গল, জল-কাদা, ধূলো—এ সব আর তোমায় ভুগতে দেব না। বার চোদ্দ বিঘে ধান-জমী, আর সম্বৎসরে বিশ-পঁচিশটে টাকা খাজনা আদায়—এতে কি আর জুটে। লোকের ভাল ভাবে চলে কখনো ? আস্‌ছে মাসেই কলকাতা চ'লে যাব। পরামর্শ আজ পাকা করেই ফেললুম।

কুঞ্জ জিজ্ঞাসা করিল, মন্ত্রণার মন্ত্রীটি হলেন কে ? পরামর্শটা কার সঙ্গে হ'ল ?

জীবনের সঙ্গে। জীবন-খুড়ো বল্লে, এ অভাগা যায়গায় কি করতে পড়ে আছ ? এমন একটা লেখবার শক্তি তোমার রয়েছে, কল্‌কাতায় গিয়ে ওইদিকেই একটু চেষ্টা-চরিত্তির করলে পরে, হয়ত একটা নামজাদা লোক হয়ে পড়বে।—তা' জীবন-খুড়ো যা সব বল্‌লে, তা ঠিকই। সুতরাং কল্‌কাতা আমি ঠিক্‌ই যা'ব।

তা হ'লে অনাহারে মৃত্যুটাও দেখ্‌ছি ঠিকই বরাতে আছে। তা', চোদ্দ বছরের মন্ত্রী আমি একজন ত' তোমার ঘরে রয়েছি ; আমার মন্ত্রণাটা যদি শোন, তা হ'লে বলি,—অমন কাযটি ক'র না। লেখক এবং কবি—সে ত' তুমি বটেই। তা' আমি তোমায় আশ্বাস দিচ্ছি—নাম তোমার এইখানে বসেই দেশময় ছড়িয়ে পড়বে। তুমি কি একজন সাধারণ লেখক। লেখার গরমে মাখনপুরের মাখনটুকু গ'লে না গিয়ে বজায় থাকলে হয় !

লেখার কথায় সামান্য একটু বিদ্রূপও নিত্যানন্দ সহ্য করিতে পারে না। তাই কুঞ্জলতার কথাটা তাহাকে একটু আঘাত করিল। সে কহিল, 'গাঁয়ের যোগী ভিখ্ পায় না'—এ ত' প্রবাদ কথা। আমার লেখা আবার লেখা! তবে এ'ও বলে রাখ্‌ছি যে, এই লেখাতেই আমি বাঙ্গালা-দেশের মধ্যে নামজাদা হ'তে পারি কি না দেখো—নিত্যানন্দের কথা-গুলির মধ্যে বিশেষ কোন রাগের কথা না থাকিলেও, বলিবার ভঙ্গিতে বেশ একটু ঝাঁঝ ছিল।

কুঞ্জলতা বলিল, তুমি রাগ করলে না কি? তোমার সঙ্গে কি আমার ভাসুর-ভাদ্দর-বৌ সম্পর্ক যে, একটু রঙ্গ-রহস্যও করতে পারব না? এই যে তুমি আমার খোঁপায় চাঁপাফুল গুঁজে দিলে, আমি কি রাগ করলুম? তবে লেখক হলেই তাদের স্বভাবটা একটু অদ্ভুত প্রকৃতির হয়. তা জানি। —তা' কল্‌কাতায় গিয়ে চালাতে পার, সে ত' ভালই। জীবন-খুড়োও যাবেন বোধ হয়?

কোন উত্তর না দিয়া নিত্যানন্দ রান্নাঘর হইতে চলিয়া গেল।

নিত্যানন্দ বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান। দেশের স্কুল হইতে সে যখন ম্যাট্রিক পাশ করে, তখন তাহার বাপ ও মা উভয়েই বাঁচিয়া ছিল। ইহাদের জমিজমা প্রভৃতি যা ছিল, তাহাতে খুব সচ্ছলেই ইহাদের সংসার চলিয়া যাইবার কথা এবং বরাবরই সেইরূপ গিয়াছে। কিন্তু পিতা-মাতার মৃত্যুর পর হইতে নিত্যানন্দের বিলাস-বাবুগিরির ওজন এমন অসম্ভব বাড়িয়া গেল যে, আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হইয়া ক্রমঃশই ঋণ দাঁড়াইতে লাগিল এবং সেই ঋণ শোধ হইতে লাগিল, পৈতৃক জমিজমাগুলি একে একে বিক্রয় করিয়া। কয় বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত বিক্রয় করিবার

পর এক্ষণে সেই তিরিশ বিঘা জমি বার-চৌদ্দ বিঘায় দাঁড়াইয়াছে। তবুও দেনার বিরাম নাই। কুঞ্জ যে গগন হালদারের কথা বলিতেছিল, সেই হালদার মহাশয়ই নিত্যানন্দের মহাজন এবং তিনিই আজ বৈকালে তাগাদায় আসিয়াছিলেন।

বাটীতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, পথে নিত্যানন্দ ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছিল যে, আসিয়াই সে এক কবিতা লিখিবে, যাহার সুরুটা হইবে এইরূপ :—

কোথা ও গো মনচোর—মন নিয়ে পালালে;
ভয়ে ভীত হোয়ে কোথা দাঁড়ালে গো আড়ালে?

কিন্তু গৃহে আসিয়া কুঞ্জের সহিত আলাপে তাহার ঐ কবিতার ভাব ও ভাষা সব হারাইয়া গেল। সে স্থলে আসিয়া দেখ দিল—একটা জিদ। সে পণ করিল, কলিকাতায় যাইতে হইবে। জীবনের ধারাটাকে একটা নূতন পথে চালিত করিতেই হইবে। এক-ঘেয়ে জীবন—অভিশপ্ত; না আছে মাধুর্য্য, না আছে বৈচিত্র্য। কুঞ্জ একটা অশিক্ষিত মেয়েমানুষ! ওদের কি কিছু বুদ্ধি-সুদ্ধি আছে? থাকেও যদি—তাহা—'প্রলয়ঙ্করী', জীবনে র‍্যাড্‌ভেঞ্চার চাই। হয় এস্‌পার, নয় ওস্‌পার! জীবনখুড়ো পাকা লোক—পাকা মাথা। দেখাই যাক্, খুড়ো-ভাইপোতে মিলে কিছু করতে পারে কি না?

পরদিন প্রভাতেই নিত্যানন্দ জীবন-খুড়ার কাছে গিয়া শুভসংবাদ দান করিল, কলিকাতা যাওয়াই ঠিক। খুড়া তাহার হাতখানা ধরিয়া জোরে একটা নাড়া দিয়া কহিলেন, **My hearty thanks to you in the name of The Great God—Kalachand!**

এইখানে Great God সম্বন্ধে একটু সংক্ষেপ পরিচয় না দিলে, কথাটার গুরুত্ব এবং মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা যাইবে না।

জীবন মিত্র—মাখনপুরের প্রায় সকলেরই খুড়া। সংসারে আগে তাঁহার সবই ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে কেহই নাই, কিছুই নাই। সব গিয়া, ছিল শুধু গ্রামের পোড়ো বাড়ীখানা আর স্ত্রী। স্ত্রীকে লইয়া ৪৮ বছর বয়স পর্য্যন্ত কলিকাতায় কাটাইবার পর, হঠাৎ বছর দুই হইল, তিনিও যখন তাহাকে ত্যাগ করিয়া গেলেন, তখন খুড়াও কলিকাতা ত্যাগ করিয়া দেশের বাটীতে আসিয়া অধিষ্ঠান করিলেন। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বরাবরই একটু-আধটু 'স্বাস্থ্য'-পানের অভ্যাস তাঁহার ছিল। স্ত্রী-বিয়োগের পর, তাঁহার শোক ভুলিবার জন্য, দিনকতক ঐ 'একটু-আধটু'টা একেবারে চরমে উঠিল। কিন্তু কিছুদিন পরে, খুড়া দেখিলেন —ঘোরতর অর্থাভাব। জলপথে জাহাজে যাওয়ার খরচ যোগানো তাঁহার দ্বারা অসম্ভব। তখন একজন সুহৃদ পরামর্শ দিলেন, একটু একটু আফিং ধরিতে। ধরিলেন। দেখিলেন, মন্দ নয়; দু'এক পয়সাতেই বেশ একটু শূন্যপথে ঘুরিয়া আসা যায়। তবে এই দুই বৎসরে মাত্রা কিছু বাড়িয়া গিয়াছে বটে, তাহা হইলেও এক আনার বেশী নয়। এই এক আনা ওজনের কালাচাঁদ তাঁহাকে ষোল আনা ওজনের আনন্দ দান করেন বলিয়াই তাঁহার কাছে তিনি—Great God.

কলিকাতা ছাড়িয়া এই দুই বৎসর খুড়া অতি কষ্টেই এবং অনিচ্ছাতেই দেশের বাড়ীতে পড়িয়া আছেন। আর একটি বিষয়েও তাঁহার কথঞ্চিৎ অসুবিধা আছে। তাঁহাকে স্বপাকে খাইতে হয়; যেহেতু গত্যন্তর নাই, এই কাযটিতে তাঁহার অনভ্যাসও যেমন,

অনিচ্ছাও তেমনই। তাই নিত্যানন্দকে যখন তিনি পরামর্শ দিলেন, চল্ গিয়ে কলকাতাতে থাক। যাক, আর নিত্যানন্দ কহিল, তাই যাব খুড়ো, তখন আনন্দে তাঁহার অন্তর নাচিয়া উঠিল এবং তাই কালাচাঁদের নামে তাঁহার অন্তর হইতে আশীর্ব্বাদের বন্যা ছুটিয়া গেল। তিনি নিত্যানন্দকে কহিলেন, দু'বেলা দুটি তৈরী ভাত আর আনাটাকের কালাচাঁদ আমায় যোগাবি, দেখবি কি রকম মতলব মাথা থেকে বেরোবে! তোর ঐ লেখার পথ দিয়েই তোর আর্থিক অবস্থা আমি ফিরিয়ে ফেলাব। সাহিত্য-স্বর্ণমন্দিরের সোনার চাবি আমি তোর হাতে তুলে দেওয়াব।

কিছু আগেই খুড়া তাঁহার প্রাতঃকালীন আধ আনা চড়াইয়াছিলেন। এক্ষণে নিত্যানন্দের হাতখানা ধরিয়া তাহাকে পার্শ্বে টানিয়া বসাইলেন।

*　　*　　*　　*

নিত্যানন্দ স-স্ত্রীক এবং স-খুড়া কলিকাতায় আসিয়াছে। টালীগঞ্জের কলাবাগান নামক পল্লীতে পনেরো টাকা ভাড়ায় ছোট একখানি বাড়ী ভাড়া করিয়া আছে। বাড়ীখানি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ভিতরে একখানি বড় শয়ন-ঘর, রান্নাঘর, বাহিরে একখানি বৈঠকখানা, উঠানটি সিমেণ্ট দিয়া বাঁধান। ইলেক্‌ট্রিক আছে, কিন্তু জলের কল নাই, তবে টিউবওয়েল আছে। দক্ষিণ খোলা। কুঞ্জ গোড়ায় বলিয়াছিল, পনেরো টাকার বাড়ীর কি দরকার, টাকা দশেকের মধ্যে একখানা দেখ্‌লে হ'ত। তাহাতে নিত্যানন্দ বলিয়াছিল, খুড়ো বলেন, পনেরোই হোক্ আর বিশই হোক্, ভাড়া ত' আর দিতে হবে না। কুঞ্জ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, দিতে হবে না কেন? নিত্যানন্দ বলিয়াছিল, খুড়ো বলেন যে, কল্‌কাতায়

ভাড়া দিয়ে থাক্‌তে হয় না ; তবে দেয় যারা, তারা সেটা 'অধিকন্তু' করে। কুঞ্জ আর কোন প্রশ্ন করে নাই।

বৈঠকখানা-ঘরেই জীবন-খুড়া তাঁহার আস্তানা পাতিয়াছেন। সঙ্গে এক হোমিওপ্যাথী ব্যাক্স রাখিয়াছেন। সকালটা এই বাক্স ঘাঁটিতেই তাঁহার কাটিয়া যায়। এ সম্বন্ধে নিত্যানন্দকে তিনি বলেন, অনেক ভেবে চিন্তে এ মৎলবটা করেছি রে! দেখছিস্ না—গরীবের জায়গা; এখানে এই দাতব্যের চিকিৎসাটা চলবে ভাল। অথচ, এই দাতব্যের ভেতর থেকেই আমাদের রোজকার বাজার খরচটা চলে যাবে এখন।

প্রথম মাসটা তানা-না না করিয়া কাটিলেও, দ্বিতীয় মাস হইতে সত্যই বেশ দু'চার জন করিয়া রোগীর আমদানী হইতেছে। খুড়ার বিনামূল্যের চিকিৎসা। শুধু শিশি পিছু চার পয়সা হিসাবে দাম দিতে হয়। তা, গড়ে প্রত্যহ সাত আট শিশি ঔষধের গ্রাহক জুটিতেছে। সুতরাং বাজার খরচের পয়সাটা, খুড়ার দাতব্য ডাক্তারী হইতেই উঠিয়া যাইতেছে। নিত্যানন্দ বলে, খুড়ো কিছু না পড়েই ডাক্তারী ফেঁদে বসলে! খুড়া জবাব দেন, পড়ে ডাক্তারী ত সকলেই করে, না-পড়ে করাটারই ভেতর ত বাহাদুরী!

কিন্তু খুড়ো, কথা হচ্ছে এই যে, লোকের প্রাণ নিয়ে কারবার; সুতরাং কত বড় একটা risk—

খুড়া তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলেন, risk কিছুই নয়। যে মরবার সে মরবে, যে বাঁচবার সে বাঁচবে, আর তা ছাড়া, চার পয়সার ওষুধ নিতে কোন ভাল লোক নিশ্চয়ই আসবে না; আসবে যত সব গরীব,

দুঃখী, কাঙাল, ফকীর লক্ষ্মীছাড়ার দল। বুঝলি না? এদের জীবনের আবার দাম কি? সন্ন্যাসী ঠাকুরের ওষুধ—এরাই খাবে!

বলিতে ভুল হইয়াছে যে, এখানে আসিয়া খুড়া একবারে সন্ন্যাস-জীবন সুরু করিয়াছেন! গেরুয়াটা নেহাৎ সাধারণ হইয়া পড়ায় তিনি মোটা লং-ক্লথের সাদা ধব্-ধবে লুঙ্গী পরেন, আর মাথায় একটি গেরুয়ার টুপি। এতদ্ভিন্ন গলায় বড়-দানা রুদ্রাক্ষের একছড়া মালা-আর উপর বাহুতে গোটা তিন চার কবচ ও মাদুলী। রাস্তার দিকের দেওয়াল-গাত্রে একখানি যে বিনামূল্যের চিকিৎসার Sign Board ঝুলাইয়া দিয়াছেন, তাহাতেও লেখা আছে—সন্ন্যাসী জীবনানন্দের দাবত্য-চিকিৎসালয়।

মোটের উপর, জীবন-খুড়া এখানে বেশ জাঁকিয়াই বসিয়াছেন। তাঁহার নধর, হৃষ্ট-পুষ্ট, স-ভুঁড়ি দেহ ও পরিধেয় ইত্যাদিতে এ অঞ্চলের সাধারণ লোকের দৃষ্টি তিনি বেশ আকর্ষণ করিয়াছেন এবং তাহার ফলে, সকাল-বেলাটায় যে লোক-সমাগম হয় এবং তাহাদের নিকট হইতে যে দক্ষিণা পড়ে, তাহাতে নিত্যকার বাজার-খরচ ছাড়া তাঁহার চা-বিড়ি, Great God এবং আরও এদিক্-সেদিকের ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া যায়।

কলিকাতায় আসিয়া খুড়া যদিচ কায একটু গুছাইয়া লইয়াছেন বটে, কিন্তু নিত্যানন্দ কিছুই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। কয়েকটি কাগজের আফিসে সে তাহার লেখা লইয়া যাতায়াত করিয়াছিল, কিন্তু কেহই তাহাকে তেমন উৎসাহ দেয় নাই। কিন্তু নিত্যানন্দ দমিবার পাত্র নহে। তবুও সে পুরাদমে তাহার লেখার খাতায় নূতন নূতন

লেখা লিখিয়া যাইতেছে এবং কাগজের আফিসে তাহা পাঠাইয়া দিতেছে।

এইরূপ একটি লেখা সেদিন "নীহারিকা" আফিস হইতে ফেরৎ আসিল। তৎসহ পত্রের আকারে কয়ছত্র ছাপা লেখা। তাহাতে নিম্নোক্তরূপ লেখা ছিল—

> গভীর দুঃখের সহিত আপনার রচনাটি ফেরং দিয়া জানাইতেছি যে, 'নীহারিকাতে' উহা প্রকাশ করিতে পারা গেল না। লেখাটি পাঠাইয়া আপনি যে 'নীহারিকা'কে স্মরণ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। আশা করি, ভবিষ্যতে এইরূপ আপনার কৃপালাভে আমরা বঞ্চিত হইব না এবং সর্ব্বদাই আপনার রচনা সাগ্রহে ও সাদরে বিবেচিত হইব।
> ইতি—
>
> 'নীহারিকা'-সম্পাদক।

লেখা ফেরৎ অসার জন্য যতটা না হউক, এই পত্রটুকুর জন্য নিত্যানন্দের আপাদ-মস্তক রাগে জ্বলিয়া উঠিল। সে মনে মনে গালি পাড়িয়া মনে মনেই কহিল সুন্দর বিলাতী পালিশকরা গলাধাক্কা! একেবারে ছাপানো General Form! উঃ, কি বিনয়! আর সেই বিনয়ের মধ্য দিয়ে কি সুন্দর অর্দ্ধচন্দ্র দান! কেন বাবা, যেটা ছাপিয়েছ, ওটা হাতে লিখে দিলে ত ধাক্কাটা এত ক'রে গলায় লাগতো না!

সে 'নীহারিকা' আফিসে গিয়া সম্পাদকের সহিত দেখা করিল। কহিল, মশাই, লেখাটা কি পছন্দ হ'ল না? সম্পাদক কহিলেন, আপনার রচনা একেবারেই কাঁচা। দিন কতক আপনি আরও মক্স করতে

থাকুন, পরে দেখা যাবে। আপনাদের এই লেখার বাতিকের জন্য, মশাই, আমরা সম্পাদকরা মারা গেলুম। আমাদের আর আপনারা এমন ক'রে ভোগাবেন না, দোহাই আপনাদের!

নিত্যানন্দ ভিতরে ভিতরে যে পরিমাণ দমিয়া গেল, রাগটাও হইল তাহার সেই পরিমাণ। সে কহিল, মক্স করতে ত বলছেন এদিকে, কিন্তু যে খসে পড়বার সময় হ'য়ে এল, মশাই। এখনো যদি একটু আধটু কাঁচাই থাকে, ত জাঁক দিয়ে পাকিয়ে নেবার ব্যবস্থাটা ক'রে ফেলুন না।

সম্পাদক একটু হাসিয়া কহিলেন, জাঁক দিলে—পাকবে না, কাঁচা : সব পচ্ ধরবে।

সেই পচাই আপনাদের মত মহাজনদের প্রেত নেশাটাই ধরলে, বাবা! বলিয়া রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে নিত্যান গুণ!

পুত্রশোক পাইলে লোকের যেমন ম তা জানিস? এক আনাতেই বোল সেইরূপ অবস্থা হইল। তাহার নয়ে যাবার কত সুবিধে। ছোট একটা উপচাইয়া উঠিয়া তাহার লাময় কালাচাঁদের একটি মাসের লীলা-ভাণ্ডার লাগিল। বোতল-গ্লাসের হাঙ্গামা নেই, কিছু ভাঙ্গবার-চোরবার

বাসায় ফিরিলে, কিছু মুখে দিতে হয় না, উবে যাবার যো নেই।—রাজী হচ্ছে না? সিতে নিত্যানন্দ বলিল, তার পর?

হয় একখানা কাদর, খাবার কত সুবিধে! টুক্ ক'রে যেন একটি স্ফূর্ত্তির জন্যে। ফেললে। কোন দুর্গন্ধ নেই, পা টলে না, কথা জড়ায় না।

কাটা ঘ' সঙ্গে, ভদ্রয়ানীভাবে সামনে বসে—দিব্যি কথা কওয়া যায়। তবে তুমি হ'লে মধ্যে বর্ষাকালটায় একটু রোসে যায়। তা, নিজে না রোসে

২২

গেলে, পেটে গিয়ে এমন ক'রে রস যোগাবে কি ক'রে। ও দ্রব্যটি তোরও একটু একটু ধরা দরকার—বিশেষ দরকার।

কেন খুড়ো ?

নইলে মাথায় ভাল লেখা যোগাবে না। যাঁরা বড় বড় লেখক, তাঁদের মধ্যে অনেকেই ওঁর মাহাত্ম্যে মুগ্ধ। তোদের বঙ্কিমবাবু ও দ্রব্যটির কি রকম গুণগান ক'রে গেছেন, পড়িছিস ত? তাঁর কমলাকান্ত কৃষ্ণকান্তর কথা মনে পড়লেই, সঙ্গে সঙ্গেই ঐ জিনিষটির কথা মনে পড়ে যায়। তোদের একজন বড় কবি বলেছেন, সে না কি ভাবের আফিং। তাই হয় ত হবে। তবে, আমি বলি, অভাবের হ'লেও, উনি পেটে গেলেই সব ভাবময়।

নিত্যানন্দ কহিল, যা'ক, ওসব শুনে আমার কোন লাভ নেই, এখন কি করা যায়, তাই ভাবছি!

জীবন-খুড়া কহিলেন, আরে, আমিও কি কম ভাবছি! একটু সবুর কর্, পাত্তা একটা ঠিকই লাগিয়ে ফেলেছি। দেখ্, একটা রূপোর মেডেল করতে কত খরচ পড়ে বল্ দেখি ?

কত আর ? টাকা তু'চ্চার।

একটু ভাল quality ?

টাকা পাঁচ সাত।

দশটা টাকাই ধরে রাখলুম। কেন না, খোদাই লেখাই আছে কি না। আচ্ছা—সে সব কাল হবে'খন। কাল খুড়ো-ভাইপো মিলে একটা পরামর্শ করা যাবে।

পরদিন খুড়ো ভাইপো মিলিয়া অনেক কিছু পরামর্শ হইল। পরামর্শ

অন্তে, নিত্যানন্দ হর্ষোৎফুল্ল অন্তরে কহিল, মতলবটা বার করেছ খুব, খুড়ো। কালকেই তা হ'লে খান তিন চার কাগজে বিজ্ঞাপনটা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

খুড়া কহিলেন, হ্যাঁ। ও বিজ্ঞাপন দিতে ত আর পয়সা লাগবে না। হু'চারখানা বড় বড় কাগজে—তা তোর আর গিয়ে কায নেই, আমাকে যেতে হবে। তুই বিজ্ঞাপনটা লিখে রাখ্।

সেইদিনই নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি লেখা হইল :—

জীবনানন্দ-পদক

একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছোট গল্পের লেখককে একটি মূল্যবান্ পদক দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রাপ্ত রচনাগুলির মধ্য হইতে ৫০টি নির্ব্বাচিত লেখা লইয়া একটি 'লটারী'র ড্রয়িং' হইবে। যাঁহার নাম প্রথম উঠিবে, তিনিই পুরস্কৃত হইবেন। রচনাশক্তি এবং ভাগ্য হু'য়েরই বিচিত্র প্রতিযোগিতা এবং পরীক্ষা। এই ব্যাপারে আমরা সারা বঙ্গের গল্প-লেখকগণকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিতেছি। পুরস্কার-প্রাপ্ত গল্পের লেখকের নাম বড় বড় সমস্ত কাগজেই প্রকাশ হইবে এবং 'রেডিও'র মারফত্ তাহা প্রচারিত হইবে। গল্প পাঠাইবার শেষ তারিখ—৩১শে শ্রাবণ। —ইতি।

সন্ন্যাসী জীবনানন্দ।

* * * * *

বিভিন্ন সংবাদপত্র-সমূহে জীবনানন্দ-পদক সম্বন্ধে বিজ্ঞাপনটি বাহির

হইবার পর হইতেই প্রত্যহ রাশি রাশি গল্প আসিতে সুরু হইল। খ্যাত, অ-খ্যাত, নামকরা, না-নামকরা, প্রবীণ, নবীন, পুরুষ, স্ত্রীলোক— সকলেরই রচনা শ্রাবণের ধারার মত, ৩১শে শ্রাবণের মধ্যে জীবন-খুড়ার হাতে আসিয়া পড়িল। খুড়া গণিয়া দেখিলেন, সর্ব্বশুদ্ধ মোট ৭৩৯টি গল্প আসিয়াছে। কেহ শুধু গল্পটি লিখিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন। কেহ বা তৎসহ একটু আবেদন নিবেদন এবং মন্তব্য যোগ করিয়া দিয়াছেন। কেহ লিখিয়াছেন—আমার গল্পটি বহু লোককে পড়িয়া শোনানো হইয়াছে, সকলেই বলিয়াছেন, প্রথম শ্রেণীর গল্প; কেহ বা সবিনয়ে জানাইয়াছেন, ইহা কল্পনা নয়—হুবহু সত্য ঘটনা তাঁহার পিসামহাশয়ের জীবনে ঘটিয়াছে। কেহ কেহ বা গল্পের সঙ্গে দু'একখানি 'সার্টিফিকেট'ও 'পিন্' করিয়া দিয়াছেন। রামকানাই কোঙার, তাঁহার 'গোঁয়ার-গোবিন্দ' নামক গল্পটির সঙ্গে যে সার্টিফিকেটখানা পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে লেখা আছে:—'শ্রীযুত রামকানাই বাবুর এই গল্পটি গল্প-সাহিত্যের কোহিনুর। কোহিনুর এক-রঙ্গা, ইহা বহু রংবিশিষ্ট। সচরাচর এরূপ গল্প চক্ষে পড়ে না। পাঠ করিয়া ইহা বক্ষে রাখিবার উপযুক্ত।'

স্ত্রীলোকদের নামাঙ্কিত রচনাগুলির সম্বন্ধে একটা কথা জোর করিয়া বলিতে পারা যায় যে, রচনার হস্তাক্ষর স্ত্রীহস্তেরই বটে; তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। অধিকাংশ রচনার সঙ্গেই 'পোষ্টেজ' দেওয়া ছিল এবং তৎসঙ্গে সবিশেষ অনুরোধ ছিল যে, গল্প পুরস্কারযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হওয়ামাত্রই যেন সংবাদ দেওয়া হয়। তিনটি লেখক এ জন্য টেলিগ্রাফ করিবার খরচটাও মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

যাহা হউক, দশ, পনর বা বিশ নয়, একবারে ৭১৯টা গল্প হস্তগত হওয়ায়, খুড়া-ভাইপোর মন আনন্দে কূল ছাপাইয়া পড়িল। নিত্যানন্দ সোল্লাসে বলিয়া উঠিল, ওঃ! ধন্য—তোমায়, খুড়ো! বলিহারি তোমার মতলবকে! Long live your Great God Kalachand!

খুড়া কহিলেন এখন থেকেই অত লাফাস্‌নি। এই ত হোল সুরু। দাঁড়া; আজ একটু বেশী ক'রে চড়িয়ে দি। বলিয়া খুড়া কৌটা হইতে খানিকটা আফিং গুলি পাকাইয়া গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর এক কাপ চা খাইয়া, মৌতাত্‌টা যখন বেশ জমিয়া উঠিল, তখন কহিলেন, কাল ঐগুলি বেছে ফেলো।

লাফাইয়া উঠিয়া নিত্যানন্দ কহিল, বিক্রী?

আহা—হা! Classify—Classify! অর্থাৎ, কোন্‌গুলি অচল, কোন্‌গুলি সচল। অচলগুলি তাড়াবন্দী ক'রে একধারে রেখে দিস্‌, ভবিষ্যতে আমার নাতি-পুতি হ'লে ঐতে দুধ গরম হ'তে পারবে। আর সচলগুলি নিয়ে, ওর ভেতর আবার ভাগ করবি ফার্ষ্টক্লাস, সেকেণ্ড ক্লাস, আর থার্ড ক্লাস।

নিত্যানন্দ চম্‌কাইয়া উঠিল। কহিল, কি বল্‌ছ খুড়ো! ঠিকই বলছি।

বাছতে গেলেই ত সব পড়তে হবে। ৭১৯টা গল্প কি একদিনে—

আহা হা, একদিনে কেন? বলছি, কাল থেকেই কায সুরু ক'রে দে। বুঝলি না?

বুঝিছি।

আর, সবই যে আগাগোড়া পড়তে হবে, তার মানে নেই। ভাতের

হাঁড়ীর ভাত, দু' একটা টিপে দেখলেই ত বোঝা যাবে। বুঝলি না?

খুব বুঝেছি।

হ্যাঁ তারপর নিজের নামে একে একে সব ছাড়তে থাক্।

প্রায় মাস দুই ধরিয়া খুড়া-ভাইপোতে ভাগা-ভাগি করিয়া গল্পগুলি সব পড়িয়া ফেলিবার পর, যখন কাট্-ছাট্ করিয়া তন্মধ্য হইতে ১১৩টি গল্প বাছিয়া লওয়া হইল এবং সেগুলির শ্রেণীবিভাগ করা হইল, তখন জীবন খুড়া কহিলেন, সমস্ত মাসিক আর সাপ্তাহিক কাগজে এইবার এক এক করে ছাড়তে সুরু ক'রে দে। কিন্তু তোর নাম দিয়ে বার করা হবে না।

নিত্যানন্দ বিস্মিত হইয়া কহিল, তবে কি তোমার নামে বার করবে? এত ব্যাপারের পর শেষে—

আহা-হা! ঘাবড়াচ্ছিস্ কেন? তোর নামেও না, আমার নামেও না। বৌমার নামে দেবো কি না ভাবছি।—নাঃ, তাও চলবে না। একটা বাজে নামে দিতে হবে; মনে কর্—হেমবরণী দেবী।

সে কি, খুড়ো? খুলে বল, বাবা! তোমার মতলবটা কি।

বলি। সাহিত্যিক নামটা খালি নিয়ে আর ত ধুয়ে খাবি না! আসল দরকার কিছু টাকার। লাখ-খানেক টাকা আমাদের চাই। এই যে ১১৩টা গল্প, এ হ'ল কি জানিস? এ হ'ল, ঐ লাখ টাকার স্তূপের কাছে আমাদের পৌঁছবার একটা কালি-কাগজের রাস্তা।

নিত্যানন্দ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া খুড়ার মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। খুড়া কহিলেন, ব্যস্ত হ'স নি নিতে, সব মতলব ধীরে ধীরে বাৎলে দেবো। জানিস্ ত—শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্।

তবে যে তুমি বলেছিলে যে সাহিত্যের স্বর্ণমন্দিরের—

সোনার চাবি তোর হাতে দেবো ?—হি হি করিয়া মৃদু হাসিতে হাসিতে খুড়া কহিলেন, তাই দেবো—তাই দেবো। আচ্ছা,—হেমবরণী আর দরকার নেই। তোর নামেই সে পান্‌সী চালিয়ে! চলে যা'ক তাই! Pice Palace অর্থাৎ পয়সা-প্রাসাদটা তুলতে হবে, সেই জন্যে আট-ঘাট বেঁধে কায করতে চাইছিলুম। যাক্—তোর নামেই চলে যা'ক। Palace বানাবার সময় যদি কিছু ব্যাঘাত এসে জুটে, Great God Kalachand আমার তা কাটিয়ে দেবেনই।

Pice Palace কথাটা নিত্যানন্দ বুঝিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল, ওটা কি ব্যাপার, খুড়ো ?

যথাসময়ে জানতে পারবি। এখন খালি যা বলি, তাই করে যা। তোকে যে বলেছি, তোর লেখার পথ দিয়েই তোর অবস্থা আমি ফিরিয়ে দেবো, তা দেবোই জানবি।

হাসিতে হাসিতে নিত্যানন্দ কহিল, সে দিন তোমার Great God এর নিন্দে কচ্ছিলুম খুড়ো কিন্তু এখন দেখছি, সত্যই তোমার Great Godএর ক্ষমতা আছে।

দেখলি ত ? যারা আমার কালচাঁদকে খালি নেশা ব'লে মনে করে, ঘেন্না করে, নিন্দে করে, তারা যেন ঐ কালাচাঁদ খেয়েই--। যা'ক্; কাল থেকেই সব একে একে ছাড়তে আরম্ভ কর্। কোন কাগজ আর বাদ দিবি না। Ist Class লেখাগুলো Ist Class কাগজে; 2nd Class গুলো 2nd Class কাগজে আর 3rd Class গুলো, 3rd Class কাগজে—বুঝিছিস ত ?

খুব বুঝিছি।

যারা দক্ষিণে দেবে, নিবি ; যারা দিতে পারবে না, নিবি না। এই ভাবে এখন ত চলুক, তারপর দেখা যাবে, তবে, এ বাড়ীতে তোর সঙ্গে আমার এইভাবে থাকাটা আর চলবে না। আমার সাইনবোর্ড খানা তুলে নিয়ে এ পাড়াতেই আলাদা একটা আড্ডা আমাকে পাততে হবে।

নিত্যানন্দ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া খুড়ার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

*　　*　　*　　*

এক বৎসর পরের কথা।

বাঙ্গালা সাহিত্যের আসরে সহসা এক নবীন লেখক অবতীর্ণ হইয়া, আসর মাত্‌ করিয়া বসিয়াছেন। পথে, ঘাটে, ট্রামে, ট্রেণে, বাসে, বৈঠকখানায়, মজলিসে—তাঁহারই কথা। এত অল্প সময়ের মধ্যে এত নাম ও যশোলাভ ইতঃপূর্ব্বে আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। যে কোন মাসিক বা সাপ্তাহিক কাগজ খুলিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, এই নবীন সাহিত্যরথীর গল্প তাহাতে আছেই। করুণ, অতি-করুণ, হাস্য বীভৎস, গম্ভীর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার রসের রচনাতেই তিনি সিদ্ধহস্ত। তা' ছাড়া, লিখন-প্রণালীটি তাঁহার লক্ষ্য করিবার জিনিষ। তিনি প্রবীণদের ধারাতেও লিখিতে যেমন পটু, নবীনদের নূতন ধারাতে লিখিতেও তেমনি পটু। 'এইটি তাঁহার নিজস্ব ধারা'—এ কথা তাঁহার উদ্দেশ্যে কেহই বলিতে পারিবে না। বিভিন্ন ধারায়, বিভিন্ন ভঙ্গিমায়, বিভিন্ন পদ্ধতিতে তাঁহার লেখনী চলে। তাঁহার রচনা, কখনও সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা রাজরাণী, কখনও

নিরাভরণা কুটীরবাসিনী কাঙ্গালিনী, কখনও অপূর্ব্ব হাব-ভাব-লীলা-বিলাসময়ী বারাঙ্গনা, কখনও চির-উপেক্ষিতা-ঘৃণিতা বস্তির অঙ্গনা। ইতোমধ্যে বহু কাগজেই তাঁহার ছবি বাহির হইয়াছে, বহু কাগজে বাহির হইবার ব্যবস্থা চলিতেছে। কোন কোন কাগজে তাঁহার বংশ-পরিচয় এবং পূর্ব্ব ইতিহাসও ইতিমধ্যে একটু আধটু বাহির হইয়া গিয়াছে সাহিত্য সংক্রান্ত সভায়, স্কুলের পারিতোষিক বিতরণ উৎসবাদিতে, লাইব্রেরীর অধিবেশনে, কোন কিছুর দ্বারোদ্ঘাটন প্রভৃতি ব্যাপারে, সভাপতির আসন তাঁহার ক্রমেই একচেটিয়া হইয়া আসিতেছে।

এমনি যিনি অসাধারণ ব্যক্তি, তাঁহার চেহারাটি কিন্তু নিতান্তই সাধারণ। সহজ সরল তাঁহার জীবনযাত্রা। মাত্র পনর টাকা ভাড়ার বাড়ীতে তিনি বাস করেন। বাড়ীতে খড়ম পায়ে, খালি গায়ে কাটান। দম্ভ একেবারেই নাই। সকলের সঙ্গে তাঁহার কথা-বার্ত্তা, আলাপ-পরিচয় ব্যবহার—যেমন ভদ্র, তেমনই বিনীত। সর্ব্বদাই তাঁহার মুখে হাসি এবং আনন্দ। এই জিনিষটি তাঁহার নামের সহিত আশ্চর্য্যভাবে মিলিয়া গিয়াছে। তাঁহার নাম—নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তী। এই অল্প কয় মাসের মধ্যেই যিনি এরূপ মান, যশঃ, কীর্ত্তি লাভে সমর্থ হইয়াছেন কয়বৎসর পরে, দেশের কত উঁচুতে তাঁহার আসন উঠিয়া যাইবে, সর্ব্বস্থানে সর্ব্বলোকে সেই আলোচনাই মহাগর্ব্বে এবং মহানন্দে করিয়া থাকে। কিন্তু জীবনানন্দের সহিত তাঁহার নিজের যে আলোচনা হয় তাহা এইরূপ :—

জীবনানন্দ বলেন, কেমন নিতে, যা বলেছিলুম, তা ঘটলো ত? তোর সাহিত্যের স্বর্ণমন্দিরের সোনার চাবি, তোকে পাইয়ে দিলুম ত?

গভীর আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা শুধু নিত্যানন্দর চোখমুখ ফুটিয়া বাহির হয়. কথা আর কিছু বাহির হয় না।

আবার কুঞ্জলতাকে নিত্যানন্দ বলে, কেমন লতা, যা ব'লে কলকাতায় এসেছিলুম, তা হ'য়েছে স্বীকার কর ত? দেশের মধ্যে এখন আমি যে একজন নামজাদা লেখক, এ কথাটা বোধ হয় তোমার এই অন্তঃপুরের পাঁচীল ডিঙ্গিয়ে তোমার কাণে এসে পৌঁছেছে?

কুঞ্জ বলে, তা পৌঁছেছে; কিন্তু তোমার নেতিয়ে-পড়া চাঁপা-ফুলটার তাজা হ'য়ে ওঠবার ত কোন লক্ষণ দেখছি না।

ক্রমশঃ দেখবে। তোমার ছোট ছোট চোখে একসঙ্গে এতবড় দেখাটা সহ্য হবে না, চোখ খারাপ হয়ে যাবে। আর তা ছাড়া, খড়ের আগুনের মত দপ্ ক'রে জ্বলে ওঠা ভাল নয় কি না। তা হ'লে খপ্ ক'রে যে তা নিভে যাবে।

তুঁষের আগুন অল্প অল্প জ্বলে অনেকক্ষণ থাকে বটে, কিন্তু তার ধোঁয়ার জ্বালায়, আমার ছোট চোখ ছেড়ে দি, তোমাদের ঐ বড় চোখই ঘন ঘন মুছতে হবে, সেটাও ভেবে দেখো।

কুঞ্জ, ধৈর্য্য ধরে থাক, তোমার কুঞ্জে আমি হীরে-পান্নার ফুল ফোটাব!

তা ত ফোটাবেই; নইলে এত লোক থাকতে তোমাকেই কেন মালীর কাযে বাহাল করব?

এইভাবে ইহাদের দিন চলিতেছে। বেশই চলিতেছে। প্রসার, প্রতিপত্তি, নাম, যশঃ, সবই নিত্যানন্দর করতলগত হইয়াছে। সংসারে পয়সা-কড়ির অনটনও আর বড় একটা নাই। বাড়ীওয়ালা এখন মাসে

মাসেই বাড়ীর ভাড়া পায়, মুদী তাহার পাওনা পায়, গয়লাকে আর আগের মত দামের জন্য বৃথা হাঁটা-হাঁটি করিতে হয় না, বাসভাড়ার অভাবে, কাগজওলাদের অফিসে আর পায়ে হাঁটিয়া পাড়ী দিতে হয় না। মোট কথা, পূর্ব্বকার দিনগুলির নির্দ্দয়তার কথা, মনে করিয়া বর্ত্তমানের দিনগুলি যেন লজ্জায় ইহাদের প্রতি খুব সদয় ব্যবহার করিয়া, এক্ষণে আসিতেছে এবং যাইতেছে। তুলনায় বলিতে হইলে বলিতে হয় যে. . ইহাদের কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার সংসারাকাশে, শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নার আলোকরাশি উপ্‌চাইয়া আসিয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু খুড়ার মনে তবুও তৃপ্তি নাই। তিনি বলেন যে, লাখ-খানেক রাজার মুখ-ওলা রূপার চাকতি না হ'লে চলবে না। এইটে হ'লেই জানব যে, Great God কালাচাঁদ আমার সত্যই আছেন. আর তাঁর প্রতি আমার এই অচলা ভক্তি—সার্থক।

আরও কয়েকমাস এইভাবে কাটিলে, খুড়া একদিন কহিলেন, নিতু, তোর পুঁজি ত কমে এসেছে। বোধ হয় আর গোটা ২৫।৩০ গল্প বেরিয়ে গেলেই একেবারে থলি-ঝাড়া অবস্থা; সুতরাং দিন থাকতে নতুনপথে চলবার উদ্যোগ আয়োজন ক'রতে হবে।

অতঃপর টালীগঞ্জের ছোট বাসা ছাড়িয়া বৌবাজার অঞ্চলে একটা বড় বাসায় সকলে উঠিয়া গিয়া খুড়ার নূতন পথে প্রথম পদক্ষেপ সুরু হইল।

তাহার পর সেই বাসার দেওয়ালের গায়ে প্রকাণ্ড এক সাইন বোর্ড ঝুলিল— :

—চৌ-চৌ—

উপন্যাস-কলেজ

অধ্যাপক—শ্রীনিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তী

এই সূত্রে কাগজে কাগজে যে সম্পাদকীয় বাহির হইল, তাহার মর্ম্ম সর্ব্বত্রই প্রায় এইরূপ :—স্বয়ং সাহিত্যানন্দ নিত্যানন্দই এই কলেজের ছাত্রবৃন্দকে গল্প, উপন্যাস, কবিতা প্রভৃতি লিখিতে শিক্ষা দিবেন। নবীন শিক্ষার্থির পক্ষে ইহা অভাবনীয় সুযোগ। দেশের সৌভাগ্য যে, নিত্যানন্দ-বাবু আপন স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়া, দেশের সন্তানদের বাণীদেবতার মন্দিরমধ্যে এইরূপে হাত ধরিয়া লইয়া যাইবার আয়োজন করিয়াছেন। আরও আনন্দের কথা যে, নিত্যানন্দের বৈরাগী অন্তর এজন্য কোনরূপ বেতনাদি লইতে নারাজ হইয়া এই কলেজের দ্বার সকলেরই নিকট বিনাব্যয়ে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। বেতনাদি তিনি লইবেন না। তবে প্রাথমিক ব্যয়াদির জন্য কেবলমাত্র পাঁচটি করিয়া টাকা প্রবেশিকা ফি স্বরূপ দিতে হয়। ধন্য সাহিত্যানন্দ! ধন্য বাঙ্গালা দেশ! আর ধন্য তুমি—বাণী-রঞ্জিত-পুস্তক-হস্তে হে ভগবতি, হে ভারতি, হে দেবি!

*　　*　　*　　*

কলিকাতা। বৌবাজার।

উপন্যাস-কলেজ।

প্রশস্ত কক্ষমধ্যে সন্ধ্যার পর ক্লাস বসিয়াছে। মেজেয় পাতা মাদুরের উপর সারিবন্দীভাবে প্রায় ৪০ জন শিক্ষার্থি আসন গ্রহণ করিয়া বসিয়া আছে। প্রত্যেকেরই হাতে একখানি করিয়া বাঁধানো খাতা এবং পকেটে ফাউন্টেন পেন। সপ্তাহের মধ্যে রবিবার কলেজ বন্ধ থাকে। তদ্ভিন্ন প্রত্যহই সন্ধ্যার পর দুইঘণ্টা করিয়া ক্লাস বসে। সোম, বুধ,

শুক্র—উপন্যাসের দিন, মঙ্গল ও বৃহস্পতি—ছোট গল্প, এবং শনিবার—কবিতা শিক্ষা দিবার নিয়ম।

আজ শনিবার—কবিতার ক্লাস। কবিতার ক্লাসের ন্যায় ছোটগল্পের ক্লাসেও অনুরূপ ছাত্রসংখ্যা। উপন্যাসের ক্লাসে এখনো খুব বেশী ছাত্র হয় নাই। সমস্ত ক্লাসের সব ছাত্রই—তরুণ। তবে কবিতার ক্লাসে দুই চারিজন বৃদ্ধ ছাত্রও আছেন, যাঁহাদের বয়স চল্লিশ পার হইয়া গিয়াছে।

নিত্যানন্দ কবিতা শিক্ষাদানসূত্রে ছাত্রদের সম্বোধন করিয়া কহিল, তা আর গান, এ দুই একই জিনিষ, ছন্দে গাঁথা, ছন্দে ভরা। ঐ আকাশ, বাহিরের ঐ অন্ধকার, এই ঝিরে-ঝিরে বাতাস যা গায়ে এসে লাগছে—এ সমস্তই কবিতা। সারা সৃষ্টিটাই মস্তবড় একটা কবিতা। তবে কবির চোখে তা দেখে নিতে হবে, তা ধরে নিতে হবে। এ চোখ বাইরের চোখ নয়, এ চোখ—মনের চোখ।

ওগো আমার প্রিয়া
আমার মনের চোখে কি রূপ দেখালে ?
পাগল করে হিয়া,
কোন সুদূরে গিয়া,
আবার তুমি আমায় ছেড়ে কোথায় লুকালে ?

অর্থাৎ মনের চোখে সে তার চিরকালের প্রিয়াকে হারিয়ে ফেলেছে। তাই বলছিলুম যে, বাইরের চোখ নয়—মনের চোখ। বাইরের চোখে দেখলুম—হয় ত—এক ভিখারিণী নারী, কিন্তু মনের চোখে হয় ত তার রাজরাজেশ্বরী ঐশ্বর্য্যময়ীর মূর্ত্তি ধরা পড়ে যাবে।.........

এইভাবেই নিত্যানন্দের উপন্যাস-কলেজের কাষ দ্রুতগতি চালিতেছে।

কুঞ্জলতাকে নিত্যানন্দ বলে, কেমন লতা, এইবার তোমার শুকনো চাঁপা তাজা হ'য়ে উঠবার মত হচ্ছে কি?

লতা জবাব দেয়, কতক-কতক।

সম্পূর্ণ তাজা হয়ে উঠবে এইবার। আর দিনকতক সবুর কর। শীগ্‌গিরই এই সব ছাত্রদের নিয়ে 'পাইস্‌প্যালেসে'র বনেদ গাঁথতে সুরু করব।

চমকাইয়া লতা কহে, কি করবে?

প্যালেস্—প্যালেস্! প্রাসাদ! পয়সা-প্রাসাদ!

মৃদুমধুর হাসির ভঙ্গিতে, গালে হাত দিয়া বিস্ময়ের সহিত কুঞ্জ বলে, এই এত ব্যাপারের পর, শেষকালে পয়সা নিয়ে প্রসাদ বিতরণ করবে?

তৃপ্তির হাসি হাসিয়া নিত্যানন্দ বলে, কি যে করব, আর কি যে হবে, তা শীগ্‌গিরই দেখতে পাবে, লতা।

এদিকে খুড়া নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করেন, নিতু রে, কালাচাঁদের কৃপায় এখন ত আর পয়সার অভাব নেই; বলছি কি, ওটা ছেড়ে এইবার আবার আগের মত জলপথ সুরু করব?

সে কি খুড়ো! ভয়ানক নেমকহারামী হবে যে তা' হ'লে!

তা হবে বটে; কিন্তু সকলে যে ঐ জিনিষটা নিয়ে বড্ড ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ক'রে,—ভাবের, অ-ভাবের, কালো—

কথাটা খুড়াকে শেষ করিতে না দিয়া, নিত্যানন্দ বলিয়া উঠিল, যার যা' খুসী ব'লে যাক না খুড়ো, Great God কালাচাঁদ যেন তাদের মুখে

চালি মাখিয়ে দেন। ও সব কথা এখন ভুলে যাও। Pice-palace. এর কাযে এইবার লাগা যাক্। এই রবিবার দুপুরবেলা আমি কলেজের ব ছাত্রকেই আসতে ব'লে দিয়েছি।

খুড়ো নীরবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

পরের রবিবার দুপুর বেলাতেই উপন্যাস কলেজের বৃহৎ হলটি ছাত্রবৃন্দের দ্বারা ভরিয়া গেল। সকলকে সম্বোধন করিয়া নিত্যানন্দ য সুদীর্ঘ এবং সারগর্ভ বক্তৃতা করিল, তাহার মর্ম্ম এই যে, নিত্যানন্দ হী হইলেও—সন্ন্যাসী। তাহার অন্তর—চির-বৈরাগী। সংসারের সুখ-বিলাস সে চাহে না।—সাহিত্যের সে চাহে সেবা; সাহিত্য সবীর সেবা, দেশের সেবা, দেশকে জগতের কাছে তুলিয়া ধরা। বহুদিন হইতে তাহার একটা বাসনা আছে যে, সে বাঙ্গালা দেশে এমন একটা কিছু করিয়া যাইবে, যাহা বাঙ্গালা এবং বাঙ্গালীকে চিরস্মরণীয়, চির-বরণীয় করিয়া রাখিবে। * * * *

য়ুরোপে আমেরিকায় সকলের নিকট যৎসামান্য অর্দ্ধপেনি, একপেনি হিসাবে সংগ্রহ করিয়া বিরাট স্মৃতি-সৌধ নির্ম্মিত হইয়া দেশকে অভিনব ভাবে গৌরবান্বিত করিয়া রাখা হইয়াছে। কত বড় বিস্ময়! কি কার্য্যকুশলতা! কি উৎসাহ! সে সব সম্ভ্রমের সহিত দেখিবার বস্তু! তাহার ইচ্ছা, এই বাঙ্গালা দেশেও ঐরূপ কিছু একটা হয়। কায—বিপুল। ইহা সমাধান করিতে, চাই বিপুল ত্যাগ স্বীকার—বিপুল সাধনা—বিপুল পরিশ্রম। নিত্যানন্দ চায়, দেশের লোকের নিকট হইতে মাত্র একটি করিয়া পয়সা সংগ্রহ দ্বারা কলিকাতায় ঐরূপ এক বিপুল, মনোরম, গর্ব্বোদ্দীপ্ত সৌধ নির্ম্মাণ করা, যাহার নাম হইবে—Pice Palace বা

পয়সা-প্রাসাদ। আগ্রায় 'তাজ' আছে, কলিকাতায় 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল' আছে বটে; কিন্তু সে সব ত সম্রাটের কীর্ত্তি। দেশের সর্ব্বসাধারণের এক পয়সার চাঁদায় এরকম বিরাট আর কি আছে?

নিত্যানন্দ ছাত্রগণকে বলিল যে, তাহারা যদি একবৎসর কাল এই কাযে তাহাকে সাহায্য করে, তাহা হইলে তাহার জীবনের একমাত্র সাধ পূর্ণ হয়। সঙ্গে সঙ্গে দেশের এক মহাগৌরবের বস্তুর সৃষ্টি হয়।

কি করিতে হইবে, ছাত্রগণ জিজ্ঞাসা করিলে, নিত্যানন্দ কহিল, তোমাদের মধ্যে পঞ্চাশ জন উৎসাহী আর পরিশ্রমী কর্ম্মী আমি চাই। তার ভেতর ৩০ জন কলকাতায় কায করবে, আর বাকী ২০ জন মফঃস্বলের বড় বড় সহরে কায করবে। প্রত্যেকের কাছেই ছাপা রসিদ থাকবে। সকলের কাছ থেকে একটা ক'রে পয়সা নিয়ে, একখানা ক'রে রসিদ খালি ছিঁড়ে দেবে। এ ছাড়া আর কিছুই নয়। তারপর যা করবার, সে সব আমি করব। এত বড় একটা কাযে একটা ক'রে পয়সা সকলেই দেবে। হয় ত কেউ কেউ দশবার করেও দেবে। ওদিকে অবশ্য প্রত্যেক কাগজের সাহায্যে এ সম্বন্ধে খুব একটা প্রচার কার্য্য চলতে থাকবে। সুতরাং এই নিয়ে দেশব্যাপী একটা সাড়া পড়ে যাবে। কারও বেশী কিছু বলতেও হবে না। তোমাদের জামার উপরে Pice-Palace এর 'ব্যাজ' আঁটা থাকবে। 'ব্যাজ' দেখে একটা ক'রে পয়সা লোকে তোমাদের ডেকে দিয়ে যাবে। আমি ভাবছি, আর দেরী না ক'রে আগামী সপ্তাহ থেকেই সব ব্যবস্থা বন্দোবস্ত ক'রে ফেলা যাক। এই মহাকায তোমাদের দ্বারা সম্পন্ন হ'লে, দেশমাতার আশীর্ব্বাদের ধারা, দেবী ভারতীর কৃপাদৃষ্টি, তোমাদের ওপর এসে পড়বে।

গুরুর আবেদনে সকল ছাত্রই উৎসাহের সহিত সাড়া দিল। .

অতঃপর নিত্যানন্দ মহানন্দে তাহাদের মধ্য হইতে ৫০ টি উৎসাহী, চতুর, কর্ম্মঠ, এবং বিশ্বাসী ছাত্রকে বাছিয়া লইল।

মহা উৎসাহে ও প্রবল উত্তেজনায় Pice-Palaceএর কার্য্য সুরু হইয়া গেল। প্রথম ক্ষেপে ছোট ছোট আকারের পঁচিশ লক্ষ রসিদ ফরম ছাপা হইল। রসিদের আকার ১॥ ইঞ্চি×২ ইঞ্চি। ৩০ জন কর্ম্মী কলিকাতা ব্যাপিয়া কার্য্য সুরু করিল; বাকী ২০ জন নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িল। নিত্যানন্দ প্রত্যেককেই বলিয়া দিল যে, প্রত্যহ পাঁচটা ক'রে টাকা প্রত্যেকের সংগ্রহ করা চাই-ই। তাহা হইতে এক টাকা করিয়া প্রত্যেকের খাই-খরচ, গাড়ীভাড়া প্রভৃতি ব্যয় বাদে চার টাকা করিয়া প্রত্যহ প্রত্যেকেই যেন জমা দিতে চেষ্টা করে।

এ দিকে সমস্ত সংবাদপত্রে Pice-Palace সম্বন্ধে বড় বড় কথায় গাঁথিয়া সংবাদ প্রচারিত হইতে লাগিল। এক দিন সমস্ত কাগজের মালিকদের নিমন্ত্রণ করিয়া নিত্যানন্দ এক বিরাট ভোজের আয়োজন করিল। ভোজ-সভায় নিত্যানন্দ প্রথমতঃ কিছু ভূমিকার পর কহিল, দীন আমি, দরিদ্র আমি; আমার কিছু নাই, কিছু চাইও না। চাওয়া এবং পাওয়া—এ দু'য়ের আকর্ষণ বহুদিন আমি কাটিয়েছি, জীবনের যবনিকা সহসা কখন্ পড়ে তা জানি না। শুধু একটা বিচিত্র বাসনা, যা মনের মধ্যে বহুদিন থেকে বাসা বেঁধে আছে, সেইটে যদি পূর্ণ ক'রে যেতে পারি, তবেই আর আমার কোন ক্ষোভ, কোন দুঃখ থাকে না।

যদি শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদ আর তোমাদের মত বন্ধুদের কৃপা-সাহায্য পাই, তবে নিশ্চয়ই আমার সাধ পূর্ণ হবে।

এদিকে Pice-Palace এর কায হু-হু করিয়া চলিতে লাগিল। নিত্যানন্দের স্নানাহারের সময় নাই। খালি অর্থ গ্রহণ; খালি মনি-অর্ডার ফারমে নামসহি। ৫০ জন কর্ম্মীর নিকট হইতে প্রত্যহ গড়ে ১৫০ টাকা হিসাবে আসিতে লাগিল। খুড়া কহিলেন, নেতা রে, কৌটয় আর তৃপ্তি হচ্ছে না, বোতল সুরু ক'রে ফেলি; কি বলিস?

নিত্যানন্দ ধমক দিয়া বলে, খুড়ো, এত বড় অধর্ম্মটা আর কোরো না, সব ভেস্তে যাবে তা হ'লে।

কুঞ্জ বলে, সত্যিই যে তোমার শুকনো চাঁপা তাজা হয়ে উঠলো গো! সত্যিই যে, অযোধ্যায় এনে আমাকে রাজরাণী ক'রে ফেললে! তুমি কি গো!

হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া নিত্যানন্দ তাহার সেই পুরানো কবিতাটি সুর করিয়া বলে—

অয়ি, কুঞ্জলতা—
মম প্রাণ-মন-বিমোহিনী!
মম প্রেম-সরোবরমাঝে
প্রফুল্ল কমল-রাশি
—বল এই ভাবে।
এমনি মধুর ভাবে করহ তাড়না।

যে হিসাবে 'তিল কুড়াইয়া তাল' হয়, সেই হিসাবে কয়েকমাস পরে দেখা গেল যে, বিরাট Pice-Palaceএর জন্য একটি একটি করিয়া পয়সা

সংগৃহীত হইয়া তাহা বত্রিশ হাজার টাকার বিরাট্ আকার প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন একদিন খুড়া নিত্যানন্দকে চুপি চুপি কহিলেন, নিতে রে, লাখের লোভ ছেড়ে দেওয়া যাক। যা হ'য়েছে, খুবই হ'য়েছে। শেষকালে 'মাছি ও মধুর কলসী'র দশা না ঘটে।

নিত্যানন্দ কহিল, তুমি কি বলছ, আর দরকার নেই? এই ৩২ হাজার নিয়েই ক্ষান্ত দি?

হঁ্যা! বুঝতে পারছিস্ না?

পারছি। তবে তাই হ'ক।

তখন সহসা একদিন সন্ন্যাসী জীবনানন্দ এবং সাহিত্যানন্দ নিত্যানন্দ কলিকাতা হইতে অন্তর্দ্ধান হইল। তাহাদের যাইবার পরই কাগজে কাগজে নিত্যানন্দ-লিখিত এই দুঃখ নিবেদনটি প্রকাশিত হইল—

গভীর দুঃখের সহিত আমার দেশবাসীকে আমি জানাইতেছি যে, Pice-Palace তুলিতে যে এক লক্ষ টাকার আমি আশা করিয়া কার্য্যে নামিয়াছিলাম, তাহা বিফলতার মধ্যে ডুবিয়া গেল। আমি হতাশ অন্তরে জানাইতেছি যে, গত কয়মাসে যৎসামান্য যাহা উঠিয়াছে, তদ্দারা Palace এর একটা সামান্য প্রাচীর তুলিতেও কুলাইবে না। হতভাগ্য বঙ্গদেশ! আমরা তাহার হতভাগ্য সন্তান! গভীর ব্যথা মনে লইয়া আমি একান্তে জীবন-যাপনের জন্য যাত্রা করিলাম। ইত্যাদি—ইত্যাদি।

অতঃপর গভীর ব্যথা মনে লইয়াই খুড়া ও ভাইপো বিপুল আয়োজনে মাখনপুরে আসিয়া অধিষ্ঠান করিলেন।

দেশে আসিয়া জীবন-খুড়া কহিলেন, নিতে রে, আমার কালাচাঁদের মাহাত্ম্য আর শক্তি দেখলি ত? যা তোরে বলেছিলুম, বল্ এখন, তা

হ'ল কি না? তাঁহার মৌতাতের সময় হইয়াছিল। এই বলিয়া তিনি তাঁহার গরদের ফতুয়ার পকেট হইতে অফিংয়ের সুবর্ণ-কৌটাটি হাতে করিয়া লইলেন।

দেবীগণের মর্ত্ত্যে আগমন

—[নক্সা]—

একদা অপরাহ্নকালে দেবরাজ ইন্দ্র নন্দনকাননমধ্যস্থ একটি বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন। তাঁহার চিন্তার বিষয়—নন্দনের শ্রী-সৌন্দর্য্য পূর্ব্বাপেক্ষা দিন দিন নষ্ট হইয়া যাইতেছে; ইহার কারণ? আদি কাল হইতে যে পারিজাত পুষ্প নন্দনের গৌরবস্বরূপ ছিল, বর্ত্তমানে সেই পরিজাত বৃক্ষ আর একটিও নাই, সকলই একে একে শুষ্ক হইয়া মরিয়া গিয়াছে। পরিজাত-শোকাকুল দেবরাজ সহসা গভীর খেদের সহিত নিজের মনে বলিয়া উঠিলেন—'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল!' সঙ্গে সঙ্গেই তিনি একটি প্রবল দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন, যাহার ফলে সম্মুখস্থ টবের 'চাইনিস্ গ্রাসে'র সরু সরু দীর্ঘ পাতাগুলি—তর্ তর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

ঠিক এই সময় শচীদেবী তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অস্তোন্মুখ তপনদেব কৌতুকচ্ছলে ইন্দ্রাণীর এক দীর্ঘ ছায়া ইন্দ্রের সম্মুখে ফেলিলেন। দেবরাজ পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, এস শচী। দেবীর এক হাতে কতকগুলি প্রস্ফুটিত এবং অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত 'ম্যাগ্‌নোলিয়া

গ্র্যাঙ্গিফ্লোরা' এবং অপর হাতে 'অলিম্বা ফ্রাগ্রান্স,' 'ইউকেরিস্', 'ফক্সিয়া', ·চন্দ্রমল্লিকা প্রভৃতি নানা রকম ফুলের গুচ্ছ।

এখানে বলা অত্যাবশ্যক যে, নন্দনের পারিজাতরাজি যমালয় জাত হইলে, সেনাপতি কার্ত্তিক অমরাপতির মনোকষ্ট দূরীকরণ মানসে মর্ত্ত্যের 'নর্শরী' হইতে যে বহু প্রকারের গাছপালা লইয়া গিয়া তথায় বসাইয়াছিলেন, ইন্দ্রাণীর হস্তস্থিত ফুলসমূহ ঐ সকল গাছেরই।

পার্শ্বস্থ একটি শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া শচীদেবী কহিলেন, একটি অনুমতির ভিখারিণী হইয়া আসিয়াছি, দিতে হইবে।

দেবরাজ কহিলেন, তোমায় অদেয় ত আমার কিছুই নেই, ইন্দ্রাণী; বল, কিসের অনুমতি।

আমরা একবার মর্ত্ত্যে বেড়াতে যাব।

দেবরাজ বিষম চমকিত হইয়া কহিলেন, মর্ত্ত্যে? তা কি কখন হয় শচী!

কেন হয় না। তোমরাও ত একবার গিয়েছিলে। তাই নিয়ে সেখানে বই ছাপাও হোয়ে গিয়েছে। তোমরা যখন গিয়েছিলে, আমরাই বা তখন যেতে পারব না কেন?

আমাদের কথা ছেড়ে দাও। তোমরা স্ত্রীজাতি, অবলা; তোমাদের কি, রাণী, শোভা পায় যে স্বর্গ ছেড়ে—

না, ও সব মামুলী কথা কিছুতেই শুনবো না; মর্ত্ত্যে যাবার অনুমতি দিতেই হবে।

দেবরাজ মনে মনে ভাবিলেন যে, স্বর্গের দরজাতেও এত মজবুত্ খিল নাই যাহা বন্ধ করিয়া যুগের হাওয়ার প্রবেশ রোধ করিতে পারা

যায়। সে হাওয়া ঊর্দ্ধমুখী হইয়া এখানেও প্রবেশ করিয়াছে, নচেৎ শচী দেবী পর্য্যন্ত—

ইন্দ্রাণী পুষ্পসমেত দুইটি হস্ত দেবরাজের কাঁধের উপর রাখিয়া, তাহার মুখের অতি কাছে আপন মুখ লইয়া গিয়া কহিলেন, অনুমতি দিতেই হবে, দিতেই হবে ; না দিলে কিছুতেই ছাড়ব না। বলিয়া তিনি স্বামীর ললাটদেশে নিজ ললাট রক্ষা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই দেবরাজের সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। দেবরাজ বুঝিলেন, তিনি যে বজ্রধর, ইন্দ্রাণীই তার মূল। তিনি শচীদেবীকে অনুমতি না দিয়া আর পারিলেন না।

দেবরাজের অনুমতি লাভ করিয়া শচীদেবী তৎক্ষণাৎ প্রফুল্ল অন্তরে লক্ষ্মীর কাছে গেলেন। সেখানে মর্ত্ত্যে যাইবার সম্বন্ধে সকল পরামর্শই পাকা হইয়া গেল। মাত্র পাঁচ জন তাঁহারা যাইবেন—শচী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, জয়া এবং অপ্সরার মধ্যে যাবেন ঊর্ব্বশী। তা'ছাড়া ইঁহাদের সঙ্গে যাইবে—সে বারের সেই উপ। যেহেতু, 'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন' কালে উপ সঙ্গে ছিলেন ; সুতরাং তরুণ-বয়স্ক হইলেও পথ-ঘাট সম্বন্ধে উপ ওয়াকিবহাল।

তবে ইহাও ব্যবস্থা হইল যে, মাত্র সাতটি দিন তাঁহারা মর্ত্ত্যে থাকিবেন এবং সে থাকা শুধু বঙ্গদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে ; কারণ, মর্ত্ত্যের অন্যান্য স্থানে এখন যুদ্ধ, বিগ্রহ, অশান্তি, গণ্ডগোল প্রভৃতি বিদ্যমান।

উপ কহিল, কোল্‌কাতাতেও বোমা পড়বার খুব সম্ভাবনা শোনা যাচ্ছে।

বরুণ কহিলেন, সেই জন্যই সাতদিনের বেশী থাকা কিছুতেই কর্ত্তব্য নয়।

মহেশ্বর গম্ভীর স্বরে কহিলেন, কলকাতায় যাবারই বা দরকার কি। কলকাতা বাদ দিয়ে বাংলার আর সব জায়গা বেড়িয়ে এলেই ত হয়।

নারায়ণ কহিলেন, ভোলানাথের ত কিছুই খেয়াল থাকে না। বাংলা দেশ যে আর নেই, সেটা আপনি ভুলেই গিয়েছেন। সারা বাঙ্গালাদেশ গুটিয়ে এখন কলকাতার মধ্যে এসে প্রবেশ করেছে।

ভোলানাথ পূর্ব্ববৎ গম্ভীর ভাবেই জিজ্ঞাসা করিলেন, কি কারণ?

নারায়ণ বলিলেন, কলকাতার মনুমেন্টের মাথায় একটা সাত-রঙ্গা খুব ঝকঝকে বিলিতী ফানুস জ্বালান হয়। ফানুসটার আলোর এত জোর যে, তা সমস্ত বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। আর বাংলাদেশের ধনীদের প্রায় অধিকাংশেরই পাখনা থাকে। ঐ আলো দেখে তারা তখন দলে দলে উড়ে ফানুসের ওপর এসে পড়লো।

ব্রহ্মা কহিলেন, আর বাকী লোক?

নারায়ণ কহিলেন, বাকী লোকদের পাখনা না থাকায় তারা খোঁড়াতে খোঁড়াতে কিছুদিন পরে এসে জমলো। মোটের ওপর বাংলাদেশ এখন স্ব স্ব স্থান হোতে ডুব দিয়ে কোলকাতায় এসে মাথা তুলেছে।

উপ চিরকালই একটু ফাজিল; কহিল, তা হোলে যাকে বলে ডুব-সাঁতার। ঠিকই বটে, সাঁতারে ওরা ভারি ওস্তাদ। সম্প্রতি ওদেরই কে-একজন সাঁতারে না কি রেকর্ড ব্রেক করেছে।

দেবরাজ তাহার দিকে একটু ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, অত হাঙ্গামাই বা দরকার কি? বাংলা দেশ ছাড়াও ত বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি রয়েচে, সেই সব জায়গায় বেড়িয়ে এলেই ত হয়।

নারায়ণ কহিলেন, তা কি হয়! সমস্ত ভারতবর্ষের মধু বাংলার বাতাসে আর মাটীতে। বোম্বাই বল, মাদ্রাজ বল, পাঞ্জাব বল, বেহার বল, উড়িষ্যা বল—এদের মধুর উৎস হ'ল—বাংলা। সেই বাংলায় না গিয়ে—

বরুণ কহিলেন, কেন নারায়ণ, আপনি নিজেই ত বাংলার বদলে উড়িষ্যাতে গিয়ে—

অধিষ্ঠান হয়েছি বটে, কিন্তু বাংলার দিকেই যে আমাকে চেয়ে থাকতে হয়। আমার দোল আর রথ উপলক্ষে রসাল বাংলা থেকে যে রসটা বছর বছর ওখানে ছুটিয়ে আনা হয়, তাতেই ও দেশের মাটী চিরকাল সরস হয়ে আছে। সে রসে শুধু সরসই করে না, শক্তও করে। যাঁ'রা শক্ত হয়ে ওঠে, তাদের মুখ থেকে এই কথাটা বীরের মত বা'র হয়।

'তোরই শিল, তোরই নোড়া;
তোরই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া।'

যাহা হউক, অনেক তর্ক-বিতর্কের পর, দেবীগণের মর্ত্ত্যে আগমন সম্বন্ধে ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত পাকা হইয়া গেল। তাঁহারা শুধু কলিকাতাতেই আসিবেন এবং সপ্তাহকাল তথায় থাকিয়া, দেখিয়া শুনিয়া, স্বর্গে ফিরিয়া যাইবেন।

* * * *

দেবীগণ আসিয়াছেন।

তাঁহারা এই সাতটা দিন কোথায় থাকিবেন, ইহা তাঁহাদের মধ্যে একটা সমস্যার সৃষ্টি করিল।

শচীদেবীর ইচ্ছা, বৌবাজার ষ্ট্রীটের উপর প্রকাণ্ড একটা হোটেল আছে, সেইখানে সকলে থাকেন। সুবৃহৎ চারিতলা বাড়ী, ব্যবস্থা বন্দোবস্ত সমস্তই আধুনিক! সর্ব্বপ্রকার খাদ্যই হিন্দুমতে প্রস্তুত হয়। ঘরে ঘরে আলো ও পাখার বন্দোবস্ত। তা' ছাড়া প্রত্যেক তলাতেই টেলিফোন এবং রেডিওর ব্যবস্থা। উর্ব্বশীরও ইচ্ছা এইখানে থাকেন। জয়ারও তাই। কিন্তু লক্ষ্মী ও সরস্বতী একেবারেই বাঁকিয়া বসিলেন। লক্ষ্মী বলিলেন, হোটেলফোটেলে থাকা আমার চলবে না। সরস্বতী বলিলেন, আমারও না।

উপ কহিল, চৌরঙ্গীর দিকে একটা ফ্ল্যাট্ ভাড়া করে থাকলে হয়। সামনেই গড়ের মাঠ। মিউজিয়ম, সিনেমা, হগমার্কেট—সব কাছেই পড়বে। গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেল ঐদিকেই। ওখানকার রুটী কি চমৎকার!

জয়াদেবী উপকে নীরব থাকিবার জন্য চোখের একটা ইঙ্গিত করিলেন।

লক্ষ্মী যেন একটু বিরক্ত হইয়াই কহিলেন, তোমাদের যার যেখানে ইচ্ছা থাক, আমার হোটেলও চলবে না, ফ্ল্যাট্-ট্যাট্ও চলবে না। আমি কোন গেরস্ত বাড়ীতে গিয়ে আশ্রয় নোবো।

সরস্বতী—কহিলেন, আমিও তাই। ফ্ল্যাটে থাকা কি আমাদের পোষায়। একটা আব্রু নেই, আড়াল নেই; একটু উঠোন নেই, কাপড়-চোপড় বিছানা-মাদুর রোদে শুখোবার একরত্তি জায়গা নেই।

উপ হাসিতে হাসিতে কহিল, সাতটা দিনের জন্যে খান দুই কাপড় নিয়ে ত এসেচেন, রোদ্দুর আপনার কিসের জন্য লাগবে, মাসিমা?

লক্ষ্মী একটু যেন বিরক্তিভরে কহিলেন, নেয়ে উঠে চুলগুলোও ত শুখোতে হবে! ও রকম আবদ্ধর ভেতর আমি থাকতে পারব না।

শেষ পর্য্যন্ত এই স্থির হইল যে, লক্ষ্মী ও সরস্বতী কোন গৃহস্থ গৃহে গিয়া থাকিবেন, আর বাকী সকলে ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটের উপর এক নব-নির্ম্মিত ছয়তোলা বাটীর সর্ব্বোচ্চতলার ফ্ল্যাট্ ভাড়া করিয়া থাকিবেন। অবশ্য সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া ছয়তোলায় কাহাকেও উঠা-নামা করিতে হইবে না, 'লিফট্' আছে। বন্দোবস্ত হইল, যে যেখানেই থাকুন. প্রত্যহ সকলে আহারাদির পর মনুমেন্টের নীচে আসিয়া মিলিত হইবেন এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সহর ঘুরিয়া বেড়াইবেন।

তদনুযায়ী লক্ষ্মী এক গৃহস্থ-গৃহে প্রবেশ করিলেন। বাটীর বৃদ্ধা গৃহকর্ত্রী লক্ষ্মীর আকৃতি-প্রকৃতি দর্শনে যৎপরোনাস্তি আনন্দের সহিত তাঁহাকে স্থান দিলেন। গৃহকর্ত্রী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নিজেদের দুরবস্থার কথা জানাইয়া বলিলেন, মা গো, সময়টা বড়ই খারাপ যাচ্ছে মা! একটি ছেলেকে সর্ব্বস্ব খুইয়ে এম, এ, বি, এল, পাশ করালুম, ষাঁড়ের গোবর হয়ে রইলো! অথচ মাস গেলে তিন চার শো টাকা খরচ। তুমি সতীলক্ষ্মী, আশীর্ব্বাদ কর, যেন মা-লক্ষ্মীর একটু কৃপা দৃষ্টি হয়

অদূরে এই বাড়ীর বুড়া ঝি কান্তর-মা একটি ছোট ছেলেকে কোলে করিয়া ঘুম পাড়াইতেছিল। পা নাচাইয়া নাচাইয়া তাহার পায়ে ব্যথা ধরিয়া গেল, তথাপি দামাল ছেলে কিছুতেই চোখ বুজিতেছিল না। সে বিরক্ত হইয়া বলিল, তা মা-ঠাকরুণ, লক্ষ্মীর ক্রেপা নেই, ষষ্ঠীর ক্রেপা খুবই আছে; শত্তুর মুখে ছাই দিয়ে এগারটি!

লক্ষ্মী দুঃখ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, তাই ত মা, এত লেখা-পড়া শিখে—

গৃহকর্ত্রী কহিলেন, বরাত, মা বরাত! এত বড় সংসার, একটি পয়সা আয় নেই! এর ওপর যত সব বাজে কাজ নিয়ে ঘোরা-ঘুরি করে। মুক্তীবিলের কি ছাই হবে, এক মাস ধরে সেই সব তোড়জোড় কচ্চে। আজকে তার ভোটা-ভুটি হচ্চে। কি হয় মা, তা বলা যায় না।

ওতে মাইনে-টাইনে কিছু নেই?

কিছু না মা, কিছু না! আমি বলি, এ সব বাজে কাজের কি দরকার? আমায় হুমকি দেয়, বলে—বাজে কি কাজের সে তুমি কি বুঝবে। তা যা'ক, যখন যেতেচে, তুমি আশীর্ব্বাদ কর মা, যেন সফল হয়।

বলিতে বলিতেই একটি ছেলে হাসিমুখে সংবাদ লইয়া আসিল—বাবার জিত্ হোয়েছে! ও পক্ষের চেয়ে বাবার আড়াইশো ভোট বেশী হোয়েছে।

কর্ত্রীঠাকুরাণী পুত্রবধূসহ লক্ষ্মীর পায়ে গড় করিয়া তাঁহার পায়ের-ধূলা মাথায় লইলেন।

এ দিকে সরস্বতী পূর্ব্বে এই কলিকাতা সহরের একটা স্থানে বহুকাল ধরিয়া বাস করিয়াছিলেন। তিনি সেই স্থানটার সন্ধানে গেলেন। সেখানে পূর্ব্বে পাশা-পাশি দুইটা সাঁকো ছিল। তিনি সেই সাঁকোর উপর তাঁহার আসন পাতিয়া ছিলেন; তন্নিম্নে স্বচ্ছ সলিলরাশির উপর তাঁহার মরাল অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইত। এবার সেই স্থানে আসিয়া দেখিলেন, সাঁকো দুটীর একটী কে কোথায় তুলিয়া লইয়া

গিয়াছে ; আর যেটি আছে, সেটির এমন জীর্ণাবস্থা যে, তদুপরি তাঁহার ভার সহ্য হইবে কি না সন্দেহ।

সুতরাং হতাশ হইয়া সেখান হইতে তিনি ফিরিলেন। ভাবিলেন, কালীঘাটে গিয়া কালীর নিকট হইতে খবরটা লইয়া আসিবেন যে, একটা সাঁকো কে লইয়া গেল এবং কোথায় লইয়া গেল।

পথে আসিতে আসিতে কালীবাড়ীর সন্নিকটে হালদারপাড়া রোডে একটি বৃহৎ তিন তলা বাটীর সামনে আসিয়া সহসা তিনি দাঁড়াইলেন এবং মনে ভাবিলেন যে, বৃথা আর খবর লইয়াই বা কি ফল। এই—ভাবিয়া তিনি সেই বৃহৎ বাটীর মধ্যেই প্রবেশ করিলেন এবং সেই বাটীতেই আশ্রয় লইলেন।

* * * *

দ্বিতীয় দিন বেলা এক প্রহরান্তে দেবীগণ আহারাদি সমাপন করিয়া মনুমেন্টের পাদদেশে আসিয়া মিলিত হইলেন এবং তথা হইতে সকলে সহর দর্শনে যাত্রা করিলেন।

তখন স্কুলের সময়। কয়েকটি কলেজগামী মেয়েকে দেখিয়া সরস্বতী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলাতে শচীদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, অমনভাবে নিঃশ্বাস ফেললে যে ?

সরস্বতী কহিলেন, মেয়েদের মূর্খ করে রাখা মোটেই ভাল নয় ; এই ভাবেই আমি মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থায় মত দিয়েছিলেম, কিন্তু দেখচি এ কি হোল!

কি হোল ?

দেখলে না, মেয়েদের স্বাস্থ্যের কত দূর অধঃপতন ঘটেছে! উপ

টপ্ করিয়া বলিল,—পড়া মুখস্থ করে করে, মনে ভাবচেন, ঐ রকম হাড়গিলের মত চেহারা ওদের হচ্চে ? তা নয়,——

শচীদেবী উপ'র দিকে বিরক্ত দৃষ্টি ফিরাইয়া কহিলেন, চুপ কর। তারপর সরস্বতীর উদ্দেশ্যে কহিলেন, বাস্তবিক—এই সব পনর, ষোল, সতর-আঠারো বছরের মেয়েরা, কেমন এদের নধর কান্তি হবে, গোল-গাল চেহারায় লালিত্য গড়িয়ে পড়বে, তার জায়গায় কি যাচ্ছেতাই সব হোয়ে গেছে ! চোখ কোটরে, গাল দুটো যেন বুড়ো মানুষদের মত বসে গেছে, পিঠে সকলের পাখনা বেরিয়েছে, বুক কুঁজো, মনে হয়—পাঁজরার হাড় ক'খানা ছাড়া আর সেখানে কিছুই নেই ! এরকমটা হোল কেন ?

সরস্বতী কহিলেন, যে জন্যেই 'হোক, এর জন্যে দোষী ওদের বাপ-মায়েরা।

হঠাৎ উপ বলিয়া উঠিল, আপনারা একটু দাঁড়াবেন, ওই কেবিনটা থেকে একটু চা খেয়ে আসব ?

জয়া ধমক দিয়া কহিলেন, ছিঃ! সত্যিকৃজাত ঐ একবাটিতে খেয়ে যাচ্চে, কার কি অসুখ আছে, তার ঠিক নেই আর তুমি ঐ বাটিতে মুখ দিয়ে খেয়ে আসবে ? তোমার প্রবৃত্তি হয় ?

শচীদেবী বিরক্ত হইয়া কহিলেন, প্রবৃত্তি না হয় হোল, কিন্তু তা' ছাড়া নানারকম অসুখের ভয়ও ত আছে। কোলকাতার ব্যাটাছেলেদের টি-বি এইখান থেকেই উৎপত্তি ; আর মেয়েদের উৎপত্তি—রোদ-বাতাস বন্ধ অন্ধকার ভাড়াটে বাড়ীগুলো।

উপ কহিল, সাহেবদের হোটেলে কিন্তু ভয়টয় নেই। ভারি পরিষ্কার

পরিচ্ছন্ন। নিজের জাতের স্বাস্থ্যের দিকে ওদের ষোল-আনা দৃষ্টি—দেখ! দেখ! কি ব্যাপার! ওরে বাবা রে, কত লোক গো!

কাহাদের বিয়ের ব্যাপারে বহুলোক তত্ত্ব লইয়া যাইতেছিল। উপ গণিয়া ফেলিল—১০৭ জন স্ত্রী-পুরুষে মিলিয়া।

শচীদেবী ব্যথার স্বরে বলিলেন, মরণোন্মুখ জাতের এই রকমই হয়! দেশের বেশীর ভাগ লোক আজ দুটি অন্নের জন্যে লালায়িত, আর দু' একজন যাদের পয়সা আছে, তারা এইভাবে বিলাসে, খেয়ালে, মূর্খতায় পয়সা নষ্ট কচ্চে! বলিতে বলিতে শচীদেবী ফুটপাতের উপর ভীষণভাবে পা পিছলাইয়া পড়িয়া যাইতে যাইতে কোনও মতে সামলাইয়া লইলেন। ফুটপাতের ওই অংশটায় সারি সারি খান-কয়েক হিন্দু-স্থানীর দোকান। তার মধ্যে ধোপা আছে, চালছোলা-ভাজা-ওয়ালা আছে, পান-বিড়ি আছে। সামনেকার ফুটপাতটা যে কর্পোরেশনের অর্থাৎ নাগরিকদের জন্য এবং উহা যে উক্ত ধোপা, ভুনা-ওলা, বিড়িওলা প্রভৃতির বাসন মাজিবার খিড়কী অথবা গৃহের প্রাঙ্গণ নয়, এ কথা প্রধান বিচারালয়ের —প্রধান 'জজ' বলিলেও কেহ বিশ্বাস করিবে না।

এই সময় ফুটপাতের উপর একটি ছোকরাবাবুর ভীষণ পতন শব্দে দেবীগণ চমকিয়া উঠিলেন। ছোকরাটি একান্ত মনে এবং একদৃষ্টিতে উর্দ্ধশীব দিকে চাহিয়া পথ চলিতেছিল। সামনে একধারে ভুনা-ওলার উচ্ছিষ্ট বাসনকোসনের গাদা পড়িয়াছিল এবং তাহারই কাছে ধোপা তাহার তোলা উনানে কয়লার আঁচ দিয়াছিল। কিছুক্ষণ আগে সেই উনানের কাঁচা কয়লার বিষম ধোঁয়া সমস্ত স্থানটিকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া

এক্ষণে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। উর্বশী-মুখ-পদ্ম-মধু-পান-রত ছোকরাটি বাসন-কোসনের গাদায় বিষম এক ধাক্কা খাইয়া জ্বলন্ত উনানের উপর মুখ থুবড়াইয়া পড়িল।

সমবেদনার সহিত লক্ষ্মী বলিয়া উঠিলেন, আহা-হা! বেচারার দুপাশের গোঁফই আধখানা করে পুড়ে গেল!

উপ কহিল, পোড়ে নি; গোঁফই ঐরকম আৰ্দ্ধেক করে কামানো।

শচী বলিলেন, হ্যাঁ ঠিকই বটে। এ দেশে যত লোক তত ফ্যাসান্। কারুর লম্বা বড় গোঁফ, কারও সাধারণ, কারো বা কামানো, আবার কারো আদ্ধেকটা কামানো, আদ্ধেকটা গোঁফ। কারও বা পনর আনা কামানো এক আনা আন্দাজ একরত্তি মাছি গোঁফ।

জয়া মুচকি হাসিয়া বলিলেন, অদ্ভুত!

শচীদেবী বলিলেন, অদ্ভুতের লক্ষণ সবতাতেই—শুধু গোঁফে নয়; দাড়িতে, চুলে, ঝুল্‌পীতে, জামায়, কামড়ে, চলনে বলনে—ভীষণ অদ্ভুত! ঐ দেখ, ঐ ছোকরাটির পাঞ্জাবীতে হাই কলার। পৃথিবীর যে কোন জাত, তাদের সব এক-রকমেরই পোষাক, খালি বাঙ্গালী ছাড়া। কেউ ধুতি কেউ লুঙ্গী, কেউ ঢিলে ইজের, কেউ পেন্টালুন, কেউ সার্ট, কেউ পাঞ্জাবী কেউ কোট, কেউ ফতুয়া, কেউ হাফসার্ট।—বলিতে বলিতে শচীদেবী ওদিক্‌কার ফুটপাথের দিকে আঙুল দিয়া একজন বাবুকে দেখাইয়া দিলেন। সকলে দেখিল, বাবুটি সাহেবদের অনুকরণে 'স্লিপিংগাউন' পরিয়া যাইতেছে, অথচ জাগ্রত অবস্থায় এবং দিন দুপুরে এবং রাস্তার মধ্য দিয়া। অদ্ভুতই বটে!

লক্ষ্মীদেবী বিমর্ষ হইয়া কহিলেন, বাস্তবিকই এরা ভয়ানক অনুকরণ-প্রিয়. সাংঘাতিক গতানুগতিক ! এ রকমটা মোটেই ভাল না। এর থেকে জানা যায় যে, একটা নতুন পথে, উন্নতির পথে চলতে এরা কি রকম পঙ্গু হয়ে গেছে। মাথা থেকে একটা নতুন কিছু বার করতে এরা শক্তি হারিয়েচে, বা সে শক্তি বর্ত্তমানে ঘুমে আচ্ছন্ন !

অদূরে একদল লোক বন্যাপীড়িতদের জন্য গান গাহিয়া ভিক্ষা করিতেছিল।

লক্ষ্মী কহিলেন, ঐ দেখ ; ঐ ডি, এল, রায়ের সেই মামুলী সুর। পথে ঘাটে ; পূজাতে-পার্ব্বণে ; ভাসানে, যেখানে যত গান—সব ঐ সুর, নতুন একটা সুরু আর এরা পায় না।

সরস্বতী কহিলেন, আমার ভাসানের সময় ঐ সুরের গান শুনে-শুনে কাণ আমার ঝালাপালা !

শচীদেবী কহিলেন, হবেই ত। এদের কোন কাজেই ত অন্তরের সঙ্গে চেষ্টা নেই। সেই গল্পের গোঁফ-খেজুরের মত শুয়ে শুয়ে এরা চারিদিক্ হাতড়ে দেখচে, যদি কিছু পাওয়া যায় ! এই দু'দিনেই আমার দেখার সাধ মিটেচে, চল স্বর্গে ফিরে যাওয়া যাক। এখানে না এসে, ইউরোপ কি আমেরিকার দিকে বেড়িয়ে এলে মানুষ দেখা হোত।

উপ কহিল, তা'হোলে ত জাত হারিয়ে আপনাকে একঘরে হোয়ে থাকতে হোত। অবিশ্যি দুঃখ বিশেষ নেই, আপনার পারিজাতই যখন আর নেই, তখন জাত না থাকলেই বা দুঃখ কিসের ?

শচীদেবী চোক-রাঙ্গানীর সহিত উপকে কহিলেন, চুপ কর !

অতঃপর সকলে সম্মুখের চৌরাস্তায় আসিয়া পড়িলেন ও তথা হইতে শ্যামবাজারের পথে অগ্রসর হইলেন।

উপ হারাইয়া গিয়াছে। সকাল হইতেই সে নিরুদ্দেশ।

চারিদিকে খুব খোঁজাখুঁজি হইল, কিন্তু শ্রীমান্‌কে কোথাও পাওয়া গেল না। মর্ত্ত্যের পথ-ঘাট চিনে বলিয়া যাহাকে সঙ্গে আনা হইয়াছিল, সে-ই পথ হারাইয়া যাইবে, ইহা যে পরিমাণ অসম্ভব, সেই পরিমাণ আশ্চর্য্যের।

তবে তাহার কি হইল? গেলই বা কোথায়? লক্ষ্মী গালে হাত দিয়া বসিলেন; সরস্বতী আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলেন; উর্ব্বশীর রূপের জলুস নিষ্প্রভ হইয়া গেল; শচীদেবী কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ়ার মত—যেন হাত-পা-হারা হইয়া বসিলেন।

কিন্তু ওরূপ ভাবে বসিয়া থাকিলেও চলে না। সকলে মিলিয়া পুনরায় খুঁজিতে বাহির হইল। লেকমার্কেটের কাছে একটা চায়ের কেবিন-ওলা তাঁহাদের সংবাদ দিল যে, একটি সুন্দর ফুট-ফুটে ছোকরা বাবু—

বাধা দিয়া শচীদেবী কহিলেন, মাথার চুলগুলো বেশ কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া ত?

—আজ্ঞে হ্যাঁ; আর রংটা খুব ফরসা।

আর চোখ দুটো খুব বড় বড়, কেমন?

—হাঁ। ভারি সুন্দর চেহারা। পরণে খুব মিহি গরদের নক্সা পাড় ধুতি আর গরদের পাঞ্জাবী গায়ে। সঙ্গে একটি একুশ-বাইশ বছরের মেয়ে। মেয়েটিও দেখতে বেশ ভালই—

সঙ্গে একুশ-বাইশ বছরের মেয়ে? তা তারা গেল কোথায়?

আমার দোকানে চা আর কেক্ টেক্ খেয়ে লেকের দিকে ত যেতে দেখলুম। কিন্তু সেটা হোচ্চে সেই সকাল বেলা। বোধ হয় তখন আটটা কি ন'টা হবে।—বলিয়া লোকটি উর্বশীর দিকে আড়ে আড়ে দেখিতে লাগিল।

তখন সকলে ঢাকুরিয়া লেকের দিকে অগ্রসর হইল।

ঠিক ওই সময়ে বালীগঞ্জ ষ্টেশনের ঐ দিকে একখানা বাটীর উপরের আর একখানা ঘরে জোরে ফ্যান্ ঘুরিতেছিল এবং সেই ফ্যানের নীচে একই কোচের দুই প্রান্তে দুই তরুণ-তরুণী বলিয়া নিয়োক্তরূপ আলাপ করিতেছিল।

তরুণী শ্রীমতী ভারবিনা কহিল, কি শুভক্ষণেই যে আজ তোমাতে আমাতে দেখা হয়েছিল! তবে কথা হে চ্চে, দেখা খালি আজই নয়; তুমি আমার জন্ম-জন্মান্তরের বুকের জিনিস, নয়নের নিধি।

তরুণটি কহিল, ঠিকই তাই বীণা! তোমাকে আমি এই নামেই ডাকব। তোমার অত বড় নামের ভারটা ফেলে দিয়ে, তুমি আমার মুখে বীণা হোয়েই বাজবে!

তরুণটি—শ্রীমান্ উপ; আর তরুণীটি শ্রীমতী ভার্বিনা। ভার্বিনা কলেজে পড়ে। তাহাদের কলেজ সকালে বসে। সে যে শুভক্ষণের কথা ইতিপূর্ব্বে বলিতেছিল, আজ সকালে কলেজে আসিবার সময়ই তাহার যোগাযোগ ঘটিয়াছিল।

ভার্বিনা কহিল, ম্যাট্রিক পাশ করেছি যেন একটা স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে' কি করে যে এক্জামিন দিলুম, কেমন করে যে পাশ করলুম—কিছুই

জানি না। তারপর আই, এ—সেও তাই। স্বপ্ন যেন দিন দিন ঘোর হোয়ে এল। কলের পুতুলের মত নিত্য কলেজে যাই আর আসি। সেই স্বপ্নরাজ্যের ভেতর মন যাকে সদাসর্ব্বদাই খুঁজে বেড়ায়, তাকে আর পায় না। অবশেষে আজ আমার চিরকালের স্বপ্নকে সত্য ক'রে দিয়ে ওগো আমার প্রিয়—

বলিয়াই সম্মুখের খোলা অর্গ্যানের ধারে বসিয়া বীণাকণ্ঠে বীণা গান ধরিল—

'ওগো আমার প্রিয়
তোমার রঙীন উত্তরীয়,'
দুলা'য়ে আসিলে দেবতা আমার—
—আমার প্রণাম নিও।

কিন্তু আঁচল দোলাইয়া আসিলেন—ভার্জ্জিনার গর্ভধারিণী। উপর-দিকে চাহিয়া তিনি কহিলেন, চল বাবা, চা হোয়েচে—খাবে চল, তুইও আয় মা।

কিসে যে কি হয়, বলা যায় না। একটুখানি চোখের দেখা, একটুখানি আলাপ, আর এই একটুখানি সময়ের মধ্যে—কি বিরাট ব্যাপার ঘটিয়া গেল! এ যেন সেই—'আমি আসিলাম, আমি দেখিলাম, এবং আমি জয় করিলাম।'

মায়ের ডাকে, দুইটি চপল প্রজাপতি উপ এবং ভার্জ্জিনা পুলকের ঢেউয়ে নাচিতে নাচিতে চা খাইতে চলিয়া গেল।

* * *

শ্রীমান্ উপ নিরুদ্দেশ হওয়ার পর চারি পাঁচ দিন অতিবাহিত হইয়া

গেল, তথাপি দেবীগণ তাহার কোন সন্ধান পাইলেন না। কালীঘাটের মা-কালী, বৌ-বাজারের ফিরিঙ্গী কালী, ঠন্‌ঠনিয়ার কালী, বাগবাজারের মদনমোহন, সিদ্ধেশ্বরী; উল্টোডাঙ্গার গোপীনাথ, হাজরা রোডের বুড়ো শিব, টালীগঞ্জ-চণ্ডীতলার মা-চণ্ডী, খিদিরপুরের ওলেশ্বরী প্রভৃতি সহর এবং সহরতলীতে যত দেব-দেবী ছিলেন সকলের কাছেই উপ'র সন্ধানের জন্য যুক্তিপরামর্শ লওয়া হইল, কিন্তু ফল কিছুই হইল না। তখন নিরুপায় হইয়া সকলে স্বর্গে ফিরিয়া যাইতে মনস্থ করিল।

যাইবার পূর্ব্বদিন সকলে একবার শেষ খোঁজ করিবার জন্য বাহির হইলেন, কিন্তু কোনই ফল হইল না।

তাঁহারা ফিরিয়া আসিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহাদের পশ্চাতে একটা বিষম হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। দেবীগণ ফিরিয়া দেখিলেন, একটি লোক মোটরের ধাক্কা খাইয়াছে, আর সঙ্গে-সঙ্গেই একটা ভীড়ের সৃষ্টি হইয়াছে।

একজন কহিল, আচ্ছা কাণা ড্রাইভার তো!

একজন কহিল, লোকটা ভারি বেঁচে গেছে।

একজন কহিল,—ড্রাইভারের কোনও দোষ নেই। লোকটাই হাঁ করে পথ চলছিল।

একজন কহিল, মেয়েমানুষের দিকে চেয়ে পথ চলতে হোলে, ফুটপাথ ছেড়ে রাস্তায় নেমে চলা ঠিক নয়।

আসল ব্যাপারটা এই যে, লোকটা লেক-মার্কেটের সেই চায়ের কেবিনওলা। সে লোলুপ দৃষ্টিতে উর্ব্বশীর দিকে চাহিয়া পথ চলিতেছিল। বোধ হয় প্রেমের ডিটেকটিভের মত সেইদিন হইতেই সে উর্ব্বশীর বাসা

এবং চলাফেরার সকল সন্ধানই রাখিত এবং উর্ব্বশীর·'কথা—সে মনোমধ্যে জপমালা করিয়া তুলিয়াছিল।

দেবীগণ অনেক বেলায় যে-যাহার বাসায় ফিরিয়া, বৈকালের দিকে আবার বাহির হইলেন। এবার বালীগঞ্জের দিকে গেলেন। বালীগঞ্জের সেই বাড়ীটিতে সেই সময় বিবাহের ভিতর দিয়া দুইটী তরুণ-হিয়া মিলন বন্ধনে বদ্ধ হইতেছিল। অর্থাৎ উপ এবং ভার্ব্বিনার বিবাহ হইতেছিল।

নবযুগের নব পদ্ধতিতে বিবাহ। সে যুগের লোকের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা হয় ত আজগুবি বলিয়া মনে হইবে; তথাপি ইহা সত্য, এবং নির্ঘাত সত্য। ভার্ব্বিনার পিতা নাই; আছেন মাতা এবং মামারা। তাঁহারা যৎপরোনাস্তি মডার্ণ। বিবাহ-ব্যাপারের চিরাচরিত অনুষ্ঠান এবং মন্ত্র-সমূহ, অনাবশ্যক বোধে ইঁহারা পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র দু'একটি প্রতিজ্ঞা বাক্যে বর-বধূকে আবদ্ধ করিয়া লইতেছেন। অবশেষে পুরোহিতের নির্দ্দেশানুযায়ী বর শ্রীমান্ উপ, বধূ শ্রীমতী ভার্ব্বিনার দুই হাত ধরিয়া কহিল—'আজ হইতে আমার হৃদয় তোমার প্রিয়তম, ভার্ব্বিনাও উপ'র হাত দুইটি ঐরূপ ধরিয়া কহিল—'আজ হইতে আমার এই হৃদয় তোমার প্রিয়তম!——বলিবার সঙ্গে-সঙ্গেই পোঁ করিয়া শাঁখ বাজিয়া উঠিল।

ঠিক এই সময়ে দেবীগণ সামনের ফুটপাথ দিয়া যাইতেছিলেন। শাঁখের শব্দে সেই দিকে চাহিতেই, বৈঠকখানা-ঘরের খোলা দরজা দিয়া ভিতরের বারান্দায় উপবিষ্ট উপ'র সহিত তাঁহাদের দৃষ্টিবিনিময় হইল। উপ চকিতে উঠিয়া পড়িয়া তর্ তর্ করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া দোতালায় পলাইয়া গেল। দেবীরা ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

*　　　*　　　*

দ্বিতলে একখানা ঘরে সকলে সমাগত। একধারে অপরাধীর মত উপ ঘাড় হেঁট করিয়া নীরবে বসিয়া আছে। উর্ব্বশী দেওয়ালে টাঙানো রবি বর্ম্মার অঙ্কিত তাহারি একখানা ছবি একান্ত মনে দেখিতেছিল আর মনে মনে বলিতেছিল, আমার ধার দিয়েও ছবি যায় না, বা ছবির ধার দিয়েও আমি যাই না।

শচীদেবী ভার্ব্বিনার মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, পাত্র সম্বন্ধে সব খবর না নিয়ে, অভিভাবকদের অজ্ঞাতে এই রকম বিয়ে দেওয়াটা আপনাদের খুবই অন্যায় হোয়েছে।

ভার্ব্বিনার মা কহিলেন, দেখুন—আজকাল পাত্রের মত হোলেই হোল। পাত্রের দেখলুম খুবই ইচ্ছে; আর তা' ছাড়া উপ বল্লেন, ওঁর বাপ-মা বা অন্য কোন অভিভাক নেই। উনি বিলেত থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে এসে বোম্বাইতে চাকরী নিয়েছেন।

লক্ষ্মী বলিলেন, উনি বল্লেন, আর আপনারা তাই বিশ্বাস করলেন? ওর শাস্তি ঘরে গিয়ে হবে'খন। এখন আমরা ওকে নিয়ে চলে যাই।

ভার্ব্বিনার মা বলিলেন, শুধু ওকে নিয়ে চলে গেলে ত হবে না। আপনাদের বউটিকেও নিয়ে যেতে হবে, কেন না, বিয়ে যখন হোয়ে গেছে, মেয়ে আর আমার এখানে থাকবে কেন?

উর্ব্বশী কহিল, আমাদের দেশে আপনার মেয়েকে পাঠাতে পারবেন?

পারতেই হবে। মেয়েছেলেকে বিয়ে দিলেই তাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাতেই হবে।

আমাদের দেশে যাওয়ায় আপনাদের পক্ষে কিন্তু বিপদ আছে ; সে বিপদের ধাক্কা সইতে পারবেন ত ?

আপনাদের দেশ অনেক দূরে বুঝি ? কোথায় দেশ আপনাদের ?

অমরাবতী।

অমরাবতী ? কোন্ জেলা ?

জেলা আকাশমণ্ডল। অনেক দূর। সেখানে যেতে হোলে প্রাণ বার করে তবে যেতে হয়। তা আপনি যখন ওর যাবার জন্যে এত জেদ কচ্ছেন, তখন ওকে নিয়েই যাই সেখানে।

দেখিতে দেখিতে চক্ষের নিমেষে ভার্ব্বিনা মেজের উপর ঢলিয়া পড়িল : তাহার চক্ষুতারকা স্থির হইল, নাড়ীর গতি বন্ধ হইল, সর্ব্বদেহ হিম হইয়া গেল।

তাহার মা ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

শচীদেবী কহিলেন, আগেই ত আপনাকে বলা হোল যে, আমাদের দেশে যেতে হোলে প্রাণ বার কোরে তবে যেতে হয় ; মানুষের পক্ষে জীয়ন্ত অবস্থায় যা'বার উপায় নেই, মৃত্যু না হোলে কেউ যেতে পারে না।

ভার্ব্বিনার মা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, আপনারা নিশ্চয় ডাকিনী যোগিনী, আমার মেয়েকে আপনাদের নিয়ে যেতে হবে না ; শুধু তাকে বাঁচিয়ে দিন। ও মা ভার্ব্বিনা, ভার্ব্বিনা ! ওমা তুই আমার অঞ্চলের নিধি, আমার চোখের মণি,—আমার কোল শূন্য কোরে তোকে কোথাও পাঠাবার নামও আর করব না। ওগো, তোমরা আমার ভার্ব্বিনাকে বাঁচিয়ে দাও।

ধীরে ধীরে আবার ভার্ব্বিনা চক্ষু চাহিল, ধীরে ধীরে আবার তাহার

নিঃশ্বাস প্রবাহিত হইল। আবার তাহার নিস্পন্দ অসাড় দেহে সাড়া ফিরিয়া আসিল, তাহার হিমাঙ্গ আবার উত্তপ্ত হইল।

তখন চোখের জল মুছিতে মুছিতে ভার্জিনার মা, ভার্জিনার হাত ধরিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন দেবীরাও উর্পকে টানিতে টানিতে বাহিরে চলিয়া আসিল।

বাহিরে আসিয়াই দেখিল, সম্মুখে দাঁড়াইয়া—শনি। তাহার রক্তাম্বর পরিহিত, রক্ত-উত্তরীয় গায়ে। শচী কহিলেন, এ কি, তুমি? তুমি কোত্থেকে হঠাৎ?

শনি কহিলেন, আমি ত কিছুদিন যাবৎ এই দেশেই আছি। মধ্যে— আবিসিনিয়ায় দিনকতক গিয়েছিলাম। তারপর স্পেন হয়ে ফেরবার পথে চায়নাতে কিছুদিন থেকে এই আসচি; এখন বাংলাতেই কিছুদিন থাকবো।

তাই থাক। বলিয়া দেবীগণ উর্পকে লইয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া আসিলেন এবং সেইদিনই স্বর্গে ফিরিবার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

সত্য-নারায়ণ নাট্য-সমিতি

(১)

'বঙ্গবন্ধু' সংবাদপত্রের অফিসে হুলস্থূল কাণ্ড পড়িয়া গিয়াছে। নীচের হল-ঘরখানিতে—যেখানে শ্যাম বাবু বসেন, সেখানে ভীড় জমিয়া গিয়াছে। ভীড় অবশ্য বাহিরের নয়—অফিসেরই কর্ম্মচারিবৃন্দ।

ভীড়ের মধ্যে নানা শ্রেণীর কর্ম্মচারী বর্ত্তমান। দপ্তরী-দরোয়ান হইতে সুরু করিয়া প্রিণ্টার, কেসিয়ার পর্য্যন্ত সকলেই আছেন। অর্থাৎ—প্রধান আছেন, অ-প্রধান আছেন; রোগা আছেন, মোটা আছেন; ফর্সা আছেন, কালো আছেন; ঢ্যাঙ্গা আছেন, বেঁটে আছেন—ইত্যাদি ইত্যাদি। ভীড়ের মধ্যে অ-প্রধান, রোগা, কালো এবং ঢ্যাঙ্গার সংখ্যাই বেশী। প্রধান এবং মোটা এবং ফর্সা এবং বেঁটে যাঁরা, তাঁদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। তন্মধ্যে আছেন—নারাণ বাবু, নগেন বাবু, শীতল বাবু, মতি বাবু, সাতকড়ি বাবু, জিতেন বাবু, হলধর বাবু, জলধর বাবু, শ্রীধর বাবু প্রভৃতি। আর—শ্যাম বাবু ত আছেনই। তাঁকে ঘিরিয়াই ভীড়; এবং শুধুই ত আর ভীড় নহে,—ভীড়, বকা-বকি, প্রশ্ন, উত্তর, তর্ক,

উপদেশ, ঠাট্টা, বিদ্রূপ, হাসি প্রভৃতি। সকলের মধ্যে গণ্ডগোল না বাধিলেও যে হট্টগোলটা চলিয়াছিল, তাহা এইরূপ—

"গেল কোথায় ?"

"যাবে আর কোথায় ? হঠাৎ হয় ত বেরিয়ে পড়বে।"

"এত দিনের অফিস, কিন্তু এমনটা ত কখনও ঘটে নি!"

"তুমি একটি আস্ত ষ্টুপিড্। ঘটে নি, ঘটতে কতক্ষণ ?"

"কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার!"

"নিশ্চয়ই।"

"পুলিসে খবর দেওয়া হোক্।"

"আচ্ছা, শ্যাম বাবু, ক'টার সময় ঠিক বলতে পারেন ?

"তুমি একটি গর্দ্দভ। কাষটা কি ওঁর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে হয়েছে যে, ঘণ্টা, মিনিট, সেকেণ্ড উনি সব দেখে রেখেছেন।"

"আচ্ছা, যখন খুব বৃষ্টিটা—"

"তোমার মাথাটা। তুমি থাম।"

ওরে—ভাই রে নারে নাইরে নারে
ভাই রে নারে—নাইরে না।
নাইরে নারে নাইরে নারে,
ভাই রে-নারে—ভাইরে না।

"থাম, নারাণ বাবু, ফুর্ত্তি বেশী হয়ে থাকে, বাসায় গিয়ে গান করবেন। আচ্ছা, শ্যাম বাবু—"

"না বাবা, ব্যাপার গুরুচরণ! এ রকম ত কখনও হয় নি।"

ব্যাপার—গুরুচরণ অর্থাৎ গুরুতরই বটে। শ্যামবাবুর আফিংয়ের

কৌটা চুরি গিয়াছে। অর্থাৎ শ্যাম বাবুর সর্ব্বস্বই গিয়াছে; এবং সেই সূত্রেই এই জটলা, বকাবকি, তর্ক, যুক্তি, হাসি, বিদ্রূপ, গান।

নীচে যখন এবম্বিধ ব্যাপার, দ্বিতলে খোদ কর্ত্তা তখন আপন আফিস-ঘরে বসিয়া, গভীর মনোযোগের সহিত সমাগত এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত।

"পূজোর তিন দিনই আপনাদের থিয়েটার হবে?

"আজ্ঞে হ্যাঁ। 'ক্লাসিকে'র ষ্টেজটা তিন দিনের জন্যেই আমরা ভাড়া নিয়েছি।"

"পালা হবে কি?"

"মেঘদূত। আর একটা প্রহসন গোছের থাকবে—'নব বিদ্যা-সুন্দর'। তিন দিনের টিকিট-বেচা টাকাটা তিন যায়গায় আমরা সাহায্য করব। এক দিনের টাকাটা আমরা দেবো—বন্যা-ফণ্ডে, এক দিনের দেবো—ভগ্নীদায়-গ্রস্ত এক গরীব ভদ্রলোককে, আর এক দিনের 'বেনিফিট্'—একটা স্কুলের জন্যেই। সেই জন্যেই—আপনাদের কাছে থেকে একটু favour চাই। অর্থাৎ বিজ্ঞাপনের চার্জ্জটা—"

"আচ্ছা, সে সম্বন্ধে যথাসাধ্য আমি 'কন্‌সেসন্' দোব। সাত দিন বিজ্ঞাপনে সাত দশে সত্তর টাকা হয়, আপনারা পঞ্চাশ টাকা দেবেন।"

"তাই হবে। আপনি মহাশয় ব্যক্তি, আপনাকে বেশী ক'রে কি আর বলবো? সাধারণের কাযে 'বেনিফিট পারফরম্যান্স'। খানকতক টিকিট আপনার 'ষ্টাফের' মধ্যে—সে আপনাকে ক'রে দিতেই হবে।

আর আপনার নিজের জন্মে 'বস্ত্র' একখানা—সে ত আপনাকে নিতেই হবে, নইলে কিছুতেই ছাড়বো না।"

কেসিয়ার সাতকড়ি বাবু গভীর চিন্তান্বিত হইয়া, ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"টাকা কুড়িটা কি আপনাকে দিয়ে গেছি ?"

"কখন্ দিলে ?"

"আপনি যখন তে-তলায় গিছলেন, আমার মনে হচ্ছে, যেন টেবিলের ওপর নোট দু'খান পেপার-ওয়েট চাপা দিয়ে রেখে গেছি।

বিলক্ষণ! হ্যাঁ মশাই সত্যনারাণ বাবু, আপনার স্লিপ পেয়ে ত আমি নেমে এলুম। নোট-ফোট টেবিলের ওপর কি কিছু ছিল? আমি ত পাই নি। সাতকড়ি নাম—সাত ব্যাপারে তোমার মন অস্থির, কোথায় অন্যমনস্ক হয়ে রেখেছ, দেখ গিয়ে। নীচের হলঘরে তোমাদের ও গোলমাল হচ্ছিল কিসের ?"

গোলমালের একটুখানি রেশ বোধ হয় উপরে কর্ত্তার কাণে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল।

"কি হয়েছিল, সাতকড়ি ?"

"ও শ্যাম বাবুর আফিংয়ের কৌটো হারিয়েছে—তাই।"

"শ্যাম বাবু আফিংয়ের কৌটো হারিয়েছে? সর্ব্বনাশ! তা হ'লে ত হুলস্থূল প'ড়ে গেছে বল? একসঙ্গে ব'সে কাজ কর, ওঁর গায়ের বাতাস ত তোমাদের গায়েও এসে লাগে। ও কুড়িটে টাকাও তা হ'লে তুমি হারিয়েছ। এইবার এক দিন বঙ্গবন্ধু অফিসটাই হারাবে। যাও যাও, টাকা কুড়িটা কোথায় রেখেছ—খোঁজ গিয়ে।"

অপ্রসন্ন-মুখে—সাতকড়ি বাবু ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। সত্যনারাণ বাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন—"আজ আসি তা হ'লে,—নমস্কার।"

"নমস্কার।"

(২)

শ্যামবাজারে 'ক্লাসিক থিয়েটারের' সম্মুখে ভীড় জমিয়াছে। পূজার তিন দিন এখানে সত্যনারায়ণ নাট্য-সমিতি অপূর্ব্ব অভিনয়-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিবেন। পালা হইবে,—যাহা কখনও হয় নাই—হইবার আশা নাই,—'মেঘদূত' আর 'নব বিদ্যা-সুন্দর'।

বেনিফিট্ নাইট্। হু হু করিয়া টিকিট বিক্রয় হইতেছে। কলিকাতার নাট্যামোদিগণের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। কালিদাসের চির-সুন্দর অমর কাব্য মেঘদূত—তাহাই নাট্যাকারে, তাহার সঙ্গে মন মাতানো রসের ফোয়ারা—বিদ্যাসুন্দর, তাহাও আবার—'নব'।

থিয়েটারের বাহিরের দেওয়ালগুলি প্রাচীর-পত্রে ঢাকা পড়িয়াছে। যিনি টিকিট কিনিয়াছেন বা কিনিবেন, তিনি তাহা সোৎসাহে পাঠ করিয়া মনে মনে গভীর তৃপ্তি লাভ করিতেছেন। আর যিনি টিকিট কিনেন নাই বা কিনিবেন না, তিনিও একান্তমনে তাহা পাঠ করিয়া বিনা মূল্যে কতক আনন্দের অধিকারী হইতেছেন।

তরুণ তরুণীর দল, কবি-সাহিত্যিকের দল, কলেজের ছাত্রদের দল, বড়লোকের আদুরে ছেলের দল—এরা ত সব আছেই, এ ছাড়া 'নব্য' ধরণের বুড়া-বুড়ী, ব্যবসাদার, দোকানদার, ফেরীওয়ালা, সম্পাদক, স্কুল-মাষ্টার প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর লোকই এই অপূর্ব্ব অভিনয় দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে এবং ইহা লইয়া পাড়ায় পাড়ায় জোর আন্দোলন-আলোচনা চলিতেছে।

মেঘদূত কাব্য হিসাবে অতুলনীয়। কিন্তু কি করিয়া তাহাকে নাট্যরূপ দেওয়া হইয়াছে, তাহা একটা পরম বিস্ময়। অভিনয় না দেখা পর্য্যন্ত দর্শকবৃন্দের চক্ষু-কর্ণের এ দ্বন্দ্ব-বিস্ময়ে কাটিবে না।

দৈনিকের বিজ্ঞাপনে এবং প্রাচীর-পত্রে ঘোষণা করা হইয়াছে—

যাহা ছিল স্বপ্ন—শুধুই স্বপ্ন

তাহা সত্যে পরিণত হইল!

অসম্ভব সম্ভব হইল!

চিরকালের বিস্ময় ঘুচিয়া গেল!

রূপে-রসে-বর্ণে-বিলাসে সৌন্দর্য্যে-মাধুর্য্যে

অপূর্ব্ব এবং অতুলনীয়!

আসুন—দেখুন—জীবন সার্থক করুন।

সেই যক্ষ

সেই যক্ষ-পত্নী

সেই রামগিরি, সেই মেঘ, সেই সোণার দাঁড়ে ময়ূর—

'যাহাকে নাচাত প্রিয়া

করতালি দিয়া দিয়া।'

তার পর নব-বিদ্যাসুন্দর।

সেই বিদ্যা, সেই সুন্দর, সেই মালিনী।

আর সর্ব্বোপরি—

মালিনীর সেই মন-মাতানো গান ও নাচ!

সত্যনারায়ণ বাবুর নাইবার খাইবার অবসর নাই। সপ্তমীপূজার আর সাতটি দিন মাত্র বাকী। কাযের আর অন্ত নাই। এ দিকে সন্ধ্যার পর হইতে প্রত্যহ জোর রিহার্শেলও চালাইতে হইতেছে। নারায়ণ বাবু তাঁহার সহকারী থাকিলেও একা সত্য বাবুকেই দশ জন হইয়া দশ দিকের কায দেখিতে হইতেছে। সন্ধ্যার সময় ক্লাবে রিহার্শেল দিতে যাইবার পূর্ব্বে তিনি 'বঙ্গবন্ধু' অফিসে আসিয়া দেখা দিলেন, এবং কর্ত্তা যতীশ বাবুকে নমস্কার জানাইয়া একখানা চেয়ার অধিকার করিয়া বসিলেন।

"আপনার কথাই ভাবছিলুম—অনেক দিন বাঁচবেন।"

"দুঃখুও তা হ'লে অনেক পেতে হবে।" বলিয়া সত্য বাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

"দেখুন, সত্যনারায়ণ বাবু—"

"আজ্ঞে, আমার নাম সত্য বাবু, নারাণ বাবু আমার সহকর্ম্মী। আমাদের দুজনের নাম মিলিয়ে সত্যনারায়ণ নাট্যসমিতির সৃষ্টি।"

"তাই না কি? দেখুন সত্য বাবু, আপনার বিলখানা নিয়ে যান। আমাদের বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ হচ্চে পঞ্চাশ টাকা। আমার 'ষ্টাফের' মধ্যে এক টাকার টিকিট ৩৫ খানা বিক্রী হয়েছে। আর আমার একখানা বক্স—২০ টাকা। তা হ'লে বিলের টাকা আর আপনাকে দিতে হবে না। আমি আপনাকে পাঁচটা টাকা দি আর বিলখানা Paid লিখে সই ক'রে দি।"

হাব-ভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া সত্য বাবু বলিলেন—"আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ। Charity performance—ধরতে গেলে, দান

আপনাদেরই,—মারফৎ আর একটু গতরের পরিশ্রম—শুধু এইটুকুই আমাদের। আচ্ছা, উঠ্‌লুম তা হ'লে; এখনই আবার রিহার্সেলে য়্যাটেণ্ড করতে হবে। গোটা আষ্টেক বাজে বোধ হয়"—বলিয়া সত্য বাবু দেয়ালের ক্লকটির দিকে চাহিলেন। যতীশ বাবু কহিলেন—"হ্যাঁ, ভাল কথা। দেখুন সত্য বাবু, আফিংয়ের কৌটো হারানোর দিন আপনি এখানে ছিলেন, না? সাতকড়ি বাবু—অর্থাৎ আমার কেসিয়ার, সেই কুড়িটে টাকা সে দিন যা হারিয়েছিলেন, তা আর পাওয়া যায় নি। তার পর আমার হাতের সোণার রিষ্ট ওয়াচটা সে দিন এই ড্রয়ারের মধ্যে ছিল—"

"সেটাও গেছে না কি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। ৮০ টাকা দামের ঘড়ীটা—"

"ড্রয়ারটা কি সে দিন খোলাই ছিল?"

"ড্রয়ার খোলাই থাকে। তবে আমি ঠিক মনে করতে পাচ্ছি না, ড্রয়ারে রেখেছিলাম কি আর কোথায় হারিয়েছি। তাই ত সে দিন বলেছিলুম যে, শ্যাম বাবুর আফিংয়ের কৌটো যখন হারিয়েছে, তখন অনেক কিছুই হারাবে। আর হলও মশাই, ঠিক তাই!—ওর বাতাসটাই হচ্ছে ছোঁয়াচে কি না।"

আরও দুই চারিটি কথার পর সত্য বাবু নমস্কার জানাইয়া সে দিনের মত বিদায় গ্রহণ করিলেন!

(৩)

হুলস্থুল ব্যাপার। অভাবনীয় কাণ্ড! গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে,—জ্বর আসে। এমন ঘটনার কথা কেহ কখনও কল্পনাও করিতে পারে না। চুরি নয়, ডাকাতি নয়, বাটপাড়ি নয়—তারও উপর। সাংঘাতিক—ভয়ঙ্কর!

সপ্তমীর সন্ধ্যায় ক্লাসিক থিয়েটরের সম্মুখে রথযাত্রার ভীড় জমিয়া গিয়াছে। কেহ পদব্রজে, কেহ রিক্সায়, কেহ ট্রামে, কেহ ট্যাক্সিতে, কেহ বা মোটরে আসিয়া এই স্থানে জমিয়াছে। কাহারও মুখে উৎসাহ, কাহারও মুখে অবসাদ, কাহারও ঘৃণা বা ক্রোধ। কেহ বলিতেছেন—"উঃ!" কেহ বলিতেছেন—"আঃ!" কেহ বলিতেছেন—"বাপ!" কেহ বা কিছুই বলিতেছেন না—একেবারেই নীরব। কিন্তু তাঁহার নীরবতার অন্তরালে এই কথাগুলি যেন ঠেলাঠেলি করিতেছে—"কি ধড়িবাজ চোর রে বাবা!"

জনতার আর বিরাম নাই। এক দল যান, অপর দল আসেন। আবার সে দল যান, আর এক দল আসেন। সকলেরই—বিস্ময়, হা-হুতাশ এবং দীর্ঘশ্বাস!

"উঃ! ফাঁকিবাজী বটে বাবা!"

"একেই বলে, মশাই, পুকুর চুরি।"

"সহর শুদ্ধু লোককে ঠকিয়ে গেল—চোর বটে।"

"আরে, তার আর হয়েছে কি! পূজোর সময় একটু রসের যোগান দিয়ে গেল। একটু হেসে নাও বাবা।"

"উঃ! প্রথমে এক টাকার একখানাই কিনেছিলাম মশাই, শেষকালে কি দুর্ম্মতি হ'ল, কুড়ি টাকার একখানা বস্ত্র কিনে ফেললুম।"

"ভালই হয়েছে। দেব-দ্বিজে ত আর কারও ভক্তি নেই। মা তাই পদার্পণ করেই কুড়ি টাকা ফাইন ক'রে দিলেন আর কি।"

"ফাইন্‌টা স্বীকার করলুম, কিন্তু সেটা দেব-দ্বিজে ভক্তি অভক্তির জন্যে নয়, সেটা হচ্ছে—হিন্দু হয়ে, হিন্দুর বৈশিষ্ট্য হারিয়ে—বিদেশের পায়ে আত্মবলি দেবার জন্যে। কেন না—"

"মশাই কি এক জন সাহিত্যিক?"

"কিম্বা কবি?"

"কিম্বা—"

এই লইয়া জন কতকের মধ্যে কথা-কাটাকাটি এবং পরে মারা-মারি হইবার উপক্রম হইল।

ও-দিককার জনকতক লোক হঠাৎ সমস্বরে উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন —"বল হরি—হরিবোল!"

ব্যাপারটা এই যে, সত্যনারায়ণ নাট্য-সমিতি হাজার দেড়েক টাকার টিকিট বেচিয়া সহসা গা-ঢাকা দিয়াছেন। 'বেনিফিট্‌ নাইট্‌, 'চ্যারিটী পারফরম্যান্স,' বন্যা, স্কুল, ভগিনীদায়, মেঘদূত, নব-বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি সকলই তাঁহাদের ভুয়া। থিয়েটারের দেওয়ালে প্রাচীর-পত্র কয়খানার উপর লাল রংয়ের কাগজে চুণের পোঁচড়া দিয়া বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে।

দূতীগিরী করতে গিয়ে, দম্‌কা পূবে বাতাসে 'মেঘ' উড়ে গেল!

মেঘও উড়িয়া গেল এবং সেই সঙ্গে হাজার দেড়েক টাকাও উড়িয়া গেল, কিন্তু মেঘের আশায় চাতকের দল আর উড়িতে চান না, তাঁহারা দলে দলে জমিতে লাগিলেন এবং এই ব্যাপার লইয়া নানা প্রকার জল্পনা-কল্পনা করিতে লাগিলেন।

সপ্তমীর সন্ধ্যায় এখানে যখন ঐরূপ ঘটনা, তখন মোগলসরাই ষ্টেসনে এক্সপ্রেস ট্রেন থামিলে মধ্যমশ্রেণীর একখানা কামরা হইতে নামিলেন—সত্য বাবু ও নারাণ বাবু। সত্য বাবুর হাতে একটি সুট্‌কেশ, নারাণ বাবুর হাতে ছোট একটি বেডিং।

আজ দশ দিন হইল সত্য বাবু এবং নারাণ বাবু কাশী আসিয়াছেন। নারদঘাটে একটি দ্বিতল কক্ষ ভাড়া লইয়া উভয়ে আছেন। কলিকাতায় 'মেঘদূতের' লীলা সমাপ্ত করিয়া দুই বন্ধু বিশ্বনাথ দর্শনে আসিয়াছেন। আর দিন কয়েক মাত্র এখানে কাটাইয়া তাঁহারা অন্যত্র গমন করিবেন।

সন্ধ্যা উৎরাইয়া গিয়াছিল। চারিদিকের দেবালয়গুলি হইতে নহবতের সুর শারদীয় বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। গঙ্গাবক্ষে অসংখ্য ভাউলে ও বজরা দীপমালায় সজ্জিত। অদূরবর্ত্তী গঙ্গার ঘাট হইতে কাহারও রামপ্রসাদী গান কাণে আসিতেছিল :—

"হৃৎকমল-মঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা।"

দ্বিতলের নিভৃতকক্ষে দুই বন্ধু মুখোমুখি বসিয়া,—সত্য বাবু এবং নারাণ বাবু। এ নাম যে তাঁহাদের মেঘের মতই মিথ্যা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু আসল নামও ত তাঁহাদের অজ্ঞাত। সুতরাং আমাদের কাছে তাঁহারা সত্যও বটে এবং নারায়ণও বটে।

সত্য বাবু পার্শ্বের স্যুট্‌কেশটার মধ্য হইতে হাত-ঘড়ীটা তুলিয়া দেখিয়া কহিলেন—"আটটা। আমি তা হ'লে আগে খেয়ে আসি। ঘড়ীটা দামী ঘড়ী, যতীশ বাবুর মুখে শুনেছি—৮০ টাকা দাম। সুবিধেমত খদ্দের পেলে ঝেড়ে দেওয়া যাবে।"

"সব চেয়ে তা হ'লে যতীশ বাবুরই দেখছি ঘাড় ভেঙ্গেছ বেশী ক'রে।"

"তা মন্দ কি। নগদ কুড়ি আর পাঁচ—পঁচিশটে টাকা ৭০ টাকার বিজ্ঞাপন, ৮০ টাকার ঘড়ী, দুটো ফাউণ্টেন পেন, আর এক কৌটো আফিং। আফিংয়ের কৌটাটা সিঁড়িতে উঠতে গিয়ে কুড়িয়ে পাই। ওটা দিয়ে দিলেই পারতুম।"

"দিলে না কেন ?"

"কেন এই জন্যে যে, নিতেই মন চায়, দিতে আর মন চায় না। যাক—পূজোর ঝোঁকটায় নেট চৌদ্দশ' এল ত? আমাকে তোর এক লাখ সাবাস দেওয়া উচিত।"

নারায়ণ বাবু সত্য বাবুর পিঠ চাপড়াইতে চাপড়াইতে কহিলেন—"বেশী সাবাস দিলে তুই আমাকেই কোন্ দিন চুরি ক'রে বেচে দিয়ে আসবি।"

নেট চৌদ্দশ'র ভিতর এই কয় দিনে প্রায় এক শত ইঁহাদের খরচ হইয়া গিয়াছে। সুটকেসটির মধ্যে তের শত এখন বর্ত্তমান। সুতরাং সুটকেসটি ঘরে রাখিয়া দুই বন্ধুর একজোটে কোথাও বাহির হওয়া হয় না। কপোত-দম্পতীর ডিমে তা দিবার মত এক জন থাকেন, এক জন যান; আবার তিনি আসেন—ইনি যান।

আসিয়া অবধি হোটেলেই আহারের বন্দোবস্ত। তাই ঘড়ী দেখিয়া সত্য বাবু কহিলেন—"আটটা বেজেছে, আমি আগে খেয়ে আসি।"

সত্য বাবু নূতন-কেনা জাপান-সিল্কের পাঞ্জাবী গায়ে চড়াইয়া হোটেলের উদ্দেশে বাহির হইয়া গেলেন। তিনি ফিরিলে নারায়ণ বাবু খাইয়া আসিবেন।

নারাণ বাবু একটা সিগারেট ধরাইয়া জানালার ধারে আসিয়া

বসিলেন। কয় দিন হইতে তাঁহার পবিত্র মনের মধ্যে একটা অপবি চিন্তা আসিয়া দেখা দিয়াছে। উহা এক্ষণে আবার দেখা দিল—

"এখনও তেরশ' মজুত। কিন্তু এখান-সেখান ঘুরে বেড়াতে হয় ত শ'পাঁচেক বেরিয়ে যাবে; থাকবে আটশ। তার অর্দ্ধেক চার শ আমার, চার শ ওর। শের পর্য্যন্ত তাই পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। হয় ত পাঁক মাখাই সার হবে। নাঃ,—ও যা ভেবেছি, তাই ক'রে ফেলা যাক্। যঃ পলায়তি স জীবতি। আর দেরীও নৈব কর্ত্তব্যং, আজই রাত্রে।"

একটা শেষ টান দিয়া, সিগারেটের শেষ টুক্‌রাটুকু নারাণ বাবু জানালার বাহিরে ফেলিয়া দিলেন।

* * *

গভীর রাত্রিতে শব্দ হইল—খটাস্।

সত্য বাবুর সজাগ ঘুম। জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি রে?"

"ঘড়ীটা দেখছি—রাত কত?"

"শুয়ে পড়—শুয়ে পড়্—রাত এখন সাড়ে বত্রিশটা, অন্ধকারে ঘড়ী দেখবি কি রকম?" আফিংখোরের ঘুমের ন্যায় তখনই আবার সত্য বাবুর চোখ বুজিয়া আসিল এবং ধীরে ধীরে নাক-ডাকা সুরু হইয়া গেল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে আবার শব্দ হইল—ধপাশ্—ধপ্!

"আবার কি রে?"

"একটা বেরাল, ভাই। মেরেছি বেটাকে সজোরে এক ঘা জুতোর বাড়ি।"

"বেশ করেছিস্।"—সঙ্গে সঙ্গেই নাসিকার মৃদু ডাক।

নারাণ বাবুর হাত হইতে সুটকেসটা মেজের উপর পড়িয়া গিয়াছিল। এবার তিনি মনে মনে, কাহার উপর জানি না, খুবই বিরক্ত হইলেন এবং আজকার মত আশা ত্যাগ করিয়া যৎপরোনাস্তি অস্বস্তির সহিত বিছানার এক ধারে আসিয়া শুইয়া পড়িলেন।

৫

"নমো নারায়ণ:—মঙ্গল হোক।"

সত্য বাবু ও নারাণ বাবু মুক্ত দরজার দিকে ফিরিয়া দেখিলেন—গেরুয়া-পরিহিত, মুণ্ডিতমস্তক, দণ্ডধারী এক তরুণ সন্ন্যাসী। গায়ে একখানি উত্তরীয় জড়ান। তন্মধ্যে এক হাতে বোধ হয় কিছু আছে। অন্য হাতে দণ্ড। সত্য বাবু কহিলেন—"কি চাই, বাবা?"

"নামো নারায়ণ—মঙ্গল হোক। কিছু খাদ্য চাই।"

"আমরা ত ঘরে খাই না, সুতরাং খাদ্যদ্রব্য কিছুই নেই।" বলিয়া সত্য বাবু একটি টাকা লইয়া সন্ন্যাসীকে দিতে গেলেন। সন্ন্যাসী কহিলেন,—"অর্থ লওয়া নিষেধ। কিছু খাদ্য ভিক্ষা চাই।"

"এই টাকা দিয়া খাদ্য কিনে নেবেন।

"অর্থ লওয়া নিষেধ।"

সন্ন্যাসী চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন।

সত্য বাবু কহিলেন,—"আচ্ছা বাবা, আপনি পনর মিনিট এখানে একটু বসুন, আমি চাল, ডাল, আটা, ঘি কিনে আনছি।"

"আচ্ছা, যাও। ভিক্ষা করিতে আসিয়া আসন গ্রহণ নিষেধ, আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিন্তু শীঘ্র আসিবে।"

সত্য বাবু টাকাটি লইয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন। সন্ন্যাসী নারাণ বাবুকে কহিলেন,—"এক স্থানে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করা আমাদের

নিষেধ। তা' ছাড়া আর এক কারণে আমি আশ্রমের বাইরে বেশীক্ষণ থাকতে পারি না, আমার একটা অসুখ আছে। মাঝে মাঝে বুক ধড়ফড় করে, মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে যাই।"

"আপনি এই মেজেতে একটু বসুন না, বাবা।"

"বলেছি ত ভিক্ষায় আসিয়া বসা আমাদের নিষেধ। গুরুর আদেশ—"

হঠাৎ বোধ হয়, তাঁহার বুক ধড়ফড় করিতে লাগিল, মাথা ঘুরিয়া উঠিল। হাতের দণ্ড হাত হইতে পড়িয়া গেল।

"বাবা, অসুস্থ বোধ করছেন কি?"

ধড়াস্ করিয়া সন্ন্যাসী মেজের উপর পড়িয়া গেলেন। নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ, সমস্ত দেহ তাঁহার কাঠের মত শক্ত হইয়া গেল। নারাণ বাবু প্রমাদ গণিলেন। এই বিপদে কি যে করিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, সন্ন্যাসীর মুখের দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। হঠাৎ সন্ন্যাসী একটু নড়িয়া উঠিলেন। অত্যন্ত যন্ত্রণার সহিত বলিলেন,—"শীগ্‌গির—একটু গুঁড়ো সোডা আর গঙ্গাজল।"

নারাণ বাবু ছুটিয়া নীচে আসিলেন ও গলির মোড়ের ডাক্তারখানাটির মধ্যে ব্যস্ত হইয়া প্রবেশ করিলেন।

জগতে কখন্ যে কি ঘটে, কিছুই বলা যায় না। সত্য বাবুর যাইবার পর সমস্ত ব্যাপার দুই চারি মিনিটের মধ্যেই ঘটিয়া গেল।

ডাক্তারখানায় মিনিট পাঁচেক দেরী হইল। সেখান হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পার্শ্বের বাটীর এক পণ্ডিতজীর নিকট হইতে এক লোটা গঙ্গাজল লইয়া নারাণ বাবু ছুটিয়া আসিতে লাগিলেন।

মনে মনে তাঁহার ভয়—'হয় ত বা কি হইল, হয় ত সন্ন্যাসী এতক্ষণ

আছেন কি নাই! সত্য বাবুও বাহির হইয়া গিয়াছেন, এ অবস্থায় তিনি একলা——'

কিন্তু সত্য বাবু আসিয়া পড়িলেন।

দ্রুতপদে সিঁড়ি উঠিতে উঠিতে সংক্ষেপে নারাণ বাবু তাঁহাকে এই সংবাদ শুনাইলেন। তিনি চমকিয়া উঠিলেন,—বোধ হয় তাঁহার পা একটু টলিয়া গেল। হাত হইতে চাউল, দাইল, আটা প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যের ঠোঙ্গাগুলি সিঁড়ির উপর ছত্রাকার হইয়া পড়িল। কিন্তু সে দিকে গ্রাহ্য না করিয়া উভয়ে ছুটিয়া উপরে আসিলেন।

কিন্তু নারাণ বাবু যা ভয় করিয়াছিলেন—তাই। সন্ন্যাসী আর নাই। অর্থাৎ স-শরীরেই নাই।

তাড়াতাড়ি দুই বন্ধু তখন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং যাহা দেখিলেন, তাহাতে বজ্রাহত হইয়া উভয়ে মেজের উপর বসিয়া পড়িলেন। সন্ন্যাসীও নাই, সুটকেসও নাই। তাহার মধ্যেই যে তের শত টাকার নোট প্রভৃতি ছিল!

সুটকেসটি পাওয়া গেল—নীচে, সিঁড়িতে উঠিবার ধারে একটা গলিমত যায়গায়। এ বাড়ীতে আর অন্য ভাড়াটিয়া কেহ ছিল না। অত বড় সুটকেসটি তরুণ সন্ন্যাসী লইয়া যায় নাই। এই নিভৃত স্থানে উহা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তাহার উপরের ডালা বরাবর ছুরিদিয়া কাটা। তন্মধ্যে কাপড়-চোপড় যাহা যাহা ছিল, সবই আছে, নাই শুধু তের শত টাকার নোট, রিষ্টওয়াচটি, দুইটা ফাউণ্টেন পেন ও এক কৌটা আফিং। তৎপরিবর্ত্তে যাহা আছে, তাহা একটি অভিনব পদার্থ— কাল রংয়ের প্রকাণ্ড একখানা কাগজ। বোধ হয়, এই কাগজখানিই

—চৌর্চৌ—

হায় উত্তরীয় মধ্যে সন্ন্যাসী ঠাকুরের হস্তে ছিল। প্রথম
ভাজ খুলিবা মেজের উপর বিস্তৃত করা হইল। তাহার
ীর উপর চূণের পোঁচড়া দিযা লেখা—
মেঘ পশ্চিমে এসে জমেছিল। ফলে—প্রবল বর্ষণ।
সব ভেসে গেল—প্রায় সুটকেস্ পর্য্যন্ত। হরি হরি।

[illegible]

দুইজন ... জুয়াচোর মিথ্ ... বিক্রয় করিয়া ...
দিয়া ...
...হল—আমাদের অফিসের ... যাগ ...
...বুদ্ধিমত্ত ও পরিশ্রমের ফলে ঐ সমস্ত টাক উদ্ধার ...
জানান যাইতেছে যে যাহারা টাক দিয়া টিকি...
টিকিটসহ আমাদের অফিসে আসিলে তাহাদের ...
ঘটনা জানিতে পারিবেন এ ক্ষেত্রে একটি কথা উ...
শ্রীযুক্ত সাতকড়ি বসু বেনারস বেড়াইতে গিয়াছি...
ন টাকাগুলি জুয়াচোরদ্বয়ের নিকট হইতে উদ্ধার করে...
নর ইচ্ছা মুখার্জী কিছু ... পুরস্কার দেওয়া কর্ত্তব্য

সমাপ্ত